কষ্টিপাথর

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
(বনফুল)

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

অসিতের পত্রাবলী

১

রাত্রি প্রায় বারোটা। চারিদিক নিস্তব্ধতন্দ্রায় আচ্ছন্ন! বাইরে অবিরাম ঝিল্লিধ্বনি। জোনাকিদের ফুলঝুরি উৎসব দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। আকাশে মেঘ। চারিদিকের অবস্থা তোমাকে চিঠি লেখবার মতোই স্বপ্নময়। কিন্তু কি লিখি। কথা তো অনেক আছে, কিন্তু তারা এত বিচলিত যে লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ করা যায় না। কারও চোখে অশ্রু, কেউ লজ্জায় সঙ্কুচিত, কেউ বিষণ্ণ, কেউ গম্ভীর। কাগজের বুকে সারি বেঁধে দাঁড়াবার মতো সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ কারও গায়ে নেই। জোর করে তাদের প্রকাশ করতে গেলে অসম্বদ্ধ প্রলাপের মতো শোনাবে।

তোমাকে আমার এই প্রথম চিঠি।' কত কি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত "প্রথম" জিনিসের মতো আমার এই চিঠিখানিও প্রকাশের অফুরন্ত আকুলতা নিয়ে অস্ফুট অসমাপ্তি তেই শেষ হবে বোধ হয়। এর জন্য তোমার দুঃখ হবে কি না জানি না, কিন্তু আমার দুঃখের আর শেষ নাই। তবে আশা করি আমার প্রাণের সুস্পষ্ট বাণী একদিন শুনতে পাবেই তুমি। আর একজনও শুনবে বলে আশা করে আছে।

···· হরিটা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না যে দাদা রাতদুপুরে উঠে বৌদিকে চিঠি লিখছে। আচ্ছা তুমি যে বার বার বললে তোমার রূপ নেই, গুণ নেই, আমি তোমাকে দয়া করে বিয়ে করেছি (সত্যি না কি ?) কিন্তু তোমার সঙ্কোচভাব কিছু দেখছি না তো। উপরন্তু তোমার সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। রূপ-গুণহীনা দয়ার পাত্রী তুমি কোথায় সসঙ্কোচে সরে' থাকবে, তা নয়,

অবলীলাক্রমে সহজ ও সপ্রতিভ ভাবে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে এমন অপূর্ব্বতালে আমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে দোলা দিয়েছ যে, আমার বিগত অতীত, এমন কি, বিস্মৃত পূর্ব্ব-জন্ম পর্য্যন্ত সেই দোলায় আন্দোলিত হচ্ছে। এই কি রূপগুণহীনা দয়ার পাত্রীর শোভন ব্যবহার? এত সাহস এত স্পর্দ্ধা কোথায় পেলে তুমি? আমার মতো গম্ভীর লোককে ভয় হয় না? বিয়েই না হয় করেছি, তাই বলে আমার সমস্ত দিনরাত্রি সমস্তক্ষণ সবটা অধিকার করে থাকবে! বেশ আব্দার তো।

.... ট্রেনে তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে কেবলই এসেছ। হঠাৎ উঠে বসেছি, পাশে দেখি সেই ফয়জাবাদ যাত্রী মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রচুর গোঁফ-দাড়ি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ট্রেনটা একটা পুলের উপর উঠছে। আবার শুলাম—আবার একটু ঘুমের ঘোর, আবার তুমি, "না, পাখাটা আমায় দাও, আমি বাতাস করব, আমার হাত কিছু ব্যথা করছে না, আঃ ছাড় না—লাগছে বড্ড", সেই দুষ্টু হাসি। আবার ঘুম ভাঙল আবার সেই লোমশ মুসলমান ভদ্রলোক। ট্রেন স্টেশনে এল। সমস্ত ব্যাপারটার উপর বীতরাগ হয়ে কেলনারে গিয়ে চা খেলাম। উপর্য্যুপরি দু' কাপ। বাকি রাস্তাটা আর ঘুম হল না। এমনি করে জ্বালাতন করবে নাকি?

মা তোমাকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন। মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। টাকার জন্য কিছু ভেবো না। টাকার জন্য পৃথিবীতে কখনও কিছু আটকায় না যদি মনের জোর থাকে। আমার চাবি পাঠাও অবিলম্বে। কাপড়-জামা সব বন্ধ যে। এই শ্লথ-স্মৃতি স্বামীটিকে নিয়ে মুশকিল হবে তোমার।

উষা কেমন আছে?

তোমার যা-কিছু দরকার হবে আমাকে জানিও। লজ্জা কোরো না লক্ষ্মীটি।

অনেক রাত হোলো। তুমি নিশ্চয় এখন সুখে ঘুমোচ্ছ। বিরক্ত করবার কেউ নেই তো। আমিও এবার শুই। আসবে নাকি স্বপ্নে করি ভর? ইতি—

তোমারই অসিত

২

শ্রীমতী হাসি দেবীর খবর কি?

সেদিন হাসিকে একটা চিঠি লিখেছি, আজও তার জবাব পেলাম না। জবাব না পাওয়ার হেতু নানারকম হঁতে পারে, কিন্তু আমার উপর তার ফল হয় মাত্র একটি—চিন্তা। হাসির জন্য চিন্তিত আছি। সেদিন অত রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি যে লিখেছিলাম মনেও নেই ভালো। নিশ্চয় এমন কিছু কর্কশ লিখিনি যার জন্য হাসির মনোকষ্ট হতে পারে। কি জানি! যে মন এখনও পাইনি তার কিসে কষ্ট হয় কিসে হয় না তা তো এখনও অজানা। সুতরাং সে গবেষণা করে লাভ নেই কোনও।

হাসি এখন কোথায় আছে এবং কেমন আছে এইটুকু খবর পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট থাকব। হাসি যেন এ খবরটুকু জানাতে দেরি না করে। শুধু শুধু একজনকে উৎকণ্ঠিত করে কি লাভ তার।

মা হাসিকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন এ খবর তো সে আগেই পেয়েছে। সে অনুমতি যে আন্তরিক এ খবরটাও তার জানা দরকার। তা না হলে হয় তো সে স্বস্তি পাবে না। অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও শুভকার্য্যও যে শ্রীমণ্ডিত হয় না এ সহজ জ্ঞান আমার আছে। অতএব হাসির কোনও প্রকার দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক।

মা খেতে ডাকছেন খেয়ে আসি। খেয়ে এসে শেষ করব চিঠিটা। হাসির খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণ। কি করছে সে ?

.... খাওয়াটা প্রচুরই হল। মায়ের খাওয়ানো। পরশু থেকে আবার চলবে মেসের সেই সনাতন ঠাকুর-সেবা। কাল লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। একথাও হাসির জানা ভাল। কি জানি হঠাৎ যদি দরকার হয় কিছু। ঠিকানাটা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম।

খেতে খেতে একটা জিনিস মনে হচ্ছিল। প্রণয়-ব্যাপারের সঙ্গে যদি কোনও খাদ্যদ্রব্যের তুলনা রীতিবিরুদ্ধ না হয় তা হলে মাছের সঙ্গে, বিশেষত ইলিশ মাছের সঙ্গে, দিলে বেশ খাপ খায়। হাসি না কি ইলিশ মাছ পছন্দ করে ? বেশ মুখরোচক মাছ—ভারী সুস্বাদু। ইলিশ মাছ ধরা কিন্তু ভারী শক্ত। তা ছাড়া, এত কাঁটা-বহুল যে প্রতি গ্রাসেই কণ্ঠ-কণ্টক হবার আশঙ্কা। কণ্ঠ-কণ্টক অর্থাৎ গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলে যে কি অস্বস্তি তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। মাছের সুস্বাদ রসনায় নেই অথচ তার বেদনাময় স্মৃতিটি কণ্ঠে বর্ত্তমান। মিলন-অবসানে বিরহের মতো। হাসি হয়তো পাতলা ঠোঁটটি উলটে বলবে—আহা, উপমার কি শ্রী ! হাসি যেমন খুশি ঠোট উলটে যা খুশি বলুক কিন্তু আমার মনে হয় যদি কোনও বিরহী বলে—"আমার মনের গলায় বিরহের কাঁটা লেগেছে—উঠতে বসতে সর্ব্বদাই খচখচ করছে—ঢোঁকগিলতে পারছি না—কাউকে দেখাতেও পারছি না" তাহলে তার বর্ণনাটা মেঘদূতের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও নিতান্ত বাজে হবে না। আমার মতে—কিন্তু না, নিজের মত নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে হাতাহাতি হবে হয়তো শেষটা। কারণ হাসি ক্রমশ চটে যাচ্ছে সে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু মুচকি হাসি উঁকি মারছে, তাও দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু থাক, দরকার কি !

.... এই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে হাসিকে কাছে পেলে এখন ভালই লাগত। মনে হচ্ছে ঘুমুলে বোধ হয় সে আশা সফল হতে পারে। ....

জাগরণের সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন তন্দ্রার সন্ধ্যায় স্বপ্নের মেঘগুলি কল্পনার রঙীন আবেশে লীলায়িত হয়ে ওঠে। কি সুন্দর স্বপ্নলোকের সেই ক্ষণিক দেখা-শোনা।

হাসির বাবা মা কি দেশে ফিরে গেলেন? আশা করি, সে রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" পড়েছে। ইতি—

তোমারই অসিত

৩

আজ তোমার এই প্রথম চিঠি পেলাম।

সত্যি হাতের লেখা এতই বিশ্রী যে চিঠিখানি পড়তে প্রায় পুরোপুরি তিন মিনিট সময় খরচ হয়ে গেল। তা ছাড়া ভাব ও ভাষা এত লঘু যে চিঠিটা একবার পড়ে তৃপ্তি হয় না, বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। অতএব লজ্জা করাটা তোমার পক্ষে ভারী সুসঙ্গত হয়েছে। তা বলে যা লিখেছ তা যেন করে ফেল না—লজ্জায় মরে যেও না—তাহলে একটু নিদারুণ রকম বাড়াবাড়ি হবে।

দেখ, আলঙ্কারিকেরা বিনয় ও লজ্জাকে মানুষের ভূষণ বলেছেন। অস্ত্র বললে আরও ঠিক হত। অতি-বিনীত ও অতি-লাজুক লোকের কাছে সকলেই হার মানতে বাধ্য। তোমার এই সরসস্নিগ্ধ নম্রনত সংগ্রামে আমি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করছি বিনা শর্ত্তে (বিনা শর্ত্তে করব কি না ভাবছি)—তুমি বিনয়বাণ নিক্ষেপ করে আর আমাকে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।

সমস্ত চিঠিখানি যেন তোমার একখানি 'ফোটোগ্রাফ'। ভাষাময়ী

হাসি, বিনয়-অভিমান-লজ্জা-অনুনয়-আশা-আকাঙ্খা-খচিত শ্রীমতী হাসি দেবীর জীবন্ত মানস যেন। মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী চিঠি দু'-একখানা লিখো।

আমার প্রথম চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম—যে আমার বাণী শোনবার আশায় কান পেতে আছে—সে কে, মেয়ে না পুরুষ, তুমি জানতে চেয়েছ। অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা লিখে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলব ? রাগ করবে না তো ? সে মেয়ে। কেমন দেখতে ? খুব চমৎকার। কিন্তু, না থাক, এর বেশি আর বলব না এখন

আপাতত কোলকাতা যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। বিনা দরকারে যাই কি করে বল। তুমি থাকাতে কোলকাতাটা লোভনীয় কিন্তু দুর্গম হয়ে উঠল। তোমারই লজ্জা আছে আমাদের বুঝি সে সব থাকতে নেই ?

এখানকার খবর ভালই। নিশ্চিন্ত ঘুমের কথা লিখেছ না ? তুমি যখন কাছে থাকতে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে জেগে থাকা যেত। এখন তুমি কাছে নেই, ঘুম যদি বা আসে নিশ্চিন্ত হতে পাবি কই।

কলমটা খুব খারাপ। খুব উদার লোকও এটাকে চলনসই বলতে কুণ্ঠিত হবে। অক্ষরগুলো কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে।

শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখ। তোমার টনসিল খুব খারাপ। সুযোগ পেলেই ওর একটা বন্দোবস্ত করব। 'কডলিভার অয়েল' খেও। এবং ....।

নাঃ, এ কলমে আর লেখা যায় না। থামলাম। চাবি পেয়েছি। ফটো পাবে।

অসিত

এ তো আচ্ছা জবরদস্তি তোমার। তুমি ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ থাকতে পারে না আমার? এ যুগে? কোনও যুগে কি সম্ভব ছিল? নূতন আলাপ করবার বেলায় না হয় তোমার কথা ভেবে সংযত হতে চেষ্টা করব কিন্তু যাদের সঙ্গে অনেক দিন আগে থেকেই আলাপ আছে তাদের কি ক'রে বিদায় করে দিই! ভারী হিংসুকে তো! না, বলব না তার নাম। নাম ঠিকানা বলে' দিই আর তুমি তার সঙ্গে গিয়ে চুলোচুলি কর! কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা ভাল, তার সঙ্গে চুলোচুলি করা যায় না। অতুল এসেছিল নাকি তোমার খোঁজে? আসতে বলেছিলাম তাকে আমিই। দরকার হলে তোমার টনসিল আর দাঁতের জন্য তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ভিজিটার্স লিষ্টে ওর নাম আমিই দিয়েছি। ওর চেহারাই অমনি রোগা রোগা। বুভুক্ষু চোখের দৃষ্টি আর উঁচু উঁচু গালের হাড় দুটো দেখে ভয় করবারই কথা। কিন্তু আসলে ও ভীতিকর নয়। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরা যেমন তেমনি, চলতি বাংলায় ছুং ছুং করা যাকে বলে—তাই করে' বেড়ায়। এদিকে পণ্ডিত লোক। সাহিত্য নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয় যদি কখনও বুঝতে পারবে। আমার আর একটি বন্ধু মহেন্দ্রও হয়তো আসবে মাঝে মাঝে। ভিজিটারস্ লিষ্টে তারও নাম দিয়েছি।

নির্জ্জন একটা কোণের ঘরে বসে' তোমায় চিঠি লিখছি! তুমি নিশ্চয় ঘুমুচ্ছ এখন। আমার কিন্তু ঘুম হবে না কিছুতে। চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেলে কি যে করব এখন সেইটেই সমস্যা। বই পড়তে ভাল লাগবে না। নিজের মনের সঙ্গে' আলাপ করব তার উপায়

নেই? মনের দুয়ারে শ্রীমতী হাসি টকটকে লালপাড় শাড়ী পরে' পাহারা দিচ্ছেন, হাসি চাহনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। মনের মধ্যে কারও প্রবেশ নিষেধ, এমন কি আমারও! কিন্তু—না, থাক এরপর যে কথাটা মনে হচ্ছে লিখব না।

খিলবন্ধ ক'রে দিয়েছি। খিল খুলে রাখার দরকার তো নেই আর। ঠাণ্ডা কনকনে হাত-পা নিয়ে কেউ আমার লেপের মধ্যে আজ তো আর ঢুকে পড়বে না। যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি যে হাসি আমার পাশটিতে শুয়ে আছে! আর ঠিক তেমনি ক'রে বলছে—"উঁ—ভারি ঘুম পেয়েছে সত্যি"—কি মজাই হয় তাহলে .... বালিশে চুলের গন্ধ রয়েছে এখনও। মনে পড়ছে কবি করুণা-নিধানের কবিতার লাইন ক'টা—

তারই চুলের গোলাপ ফুলের
শুষ্ক ধূসর পাঁপড়ি এই
সেই উপাধান শয়ন শিথান
শূন্য আধেক সে আজ নেই—

কি করছ তুমি এখন? উঃ, এত দেখতে ইচ্ছে করছে। সত্যি বল না কেন এত খারাপ লাগে?

ক্রমাগত লিখে গেলে সময়-সমস্যার সমাধান হয় বটে কিন্তু মনের অবস্থা এত বিশৃঙ্খল যে বেশি কিছু লেখা অসম্ভব।

অনেক আদর জানাচ্ছি ....

শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখো লক্ষ্মীটি। উত্তর দিতে দেরি করো না। ইতি—

তোমার অসিত

৫

১০-২-৪৯

দেহটাকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছেছি কোনক্রমে, মনটা কিন্তু এখনও পৌঁছয়নি। সে কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কোথাও ঘুরছে এখন। তাকে ধ'রে বেঁধে পাঠিয়ে দাও তো লক্ষ্মীটি। সে না এলে পড়াশোনা করব কি করে?

বুঝলে, ধরা পড়িনি কিন্তু। বাইরের কারও কাছে ধরা না পড়লেও নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছি। তুমি যখন লিখেছিলে 'এসো', আমি তখন ভেবেছিলাম 'যাব না'। নানাবিধ নৈতিক যুক্তি চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, খবরদার। কিন্তু হঠাৎ চলে গেলাম এবং তখন (মানে যাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে) মনকে বোঝালাম যে, বোর্ডিংয়ে 'সাট' পেয়েছে কি না, কোথায় আছে, কেমন আছে, ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী হিসেবে আমার একটু খোঁজ-খবর করা উচিত। নিজের কাছে নিজের চুরি ধরা পড়ে' গিয়ে বেশ মজা লাগছে এখন। খুব খারাপও লাগছে কিন্তু, আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে নয়, চলে এসেছি ব'লে। মনে পড়ছে মেঘদূতের শ্লোক—

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে।

রাত্রে আমার জন্য মন কেমন করবে না কি তোমার? বিরহী যক্ষ এ বিষয়ে যতটা নিশ্চিত হয়েছিলেন ততটা হবার সাহস হয়নি আমার এখনও।.... দিনের কোলাহল থেমে গেছে। একা ঘরে পুরাতন সঙ্গী দুটিকে নিয়ে শুয়ে আছি—কম্বল আর বালিশ। এরা যেন আমার উপর অভিমান করেছে বলে' মনে হচ্ছে। এদের মনের ভাবটা যেন, আজ আমাদের ভাল লাগছে না, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন—

ইত্যাদি। বেচারারা নিতান্তই জড়পদার্থ কি-না, জীবন্ত প্রাণের মনস্তত্ব তাই বুঝতে পারছে না। কিম্বা হয়তো পারছে (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা মানলে) কিন্তু বলছে না কিছু। হিংসেয় জ্বলে' মরছে নীরবে। তা যদি হয় তা হলে সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু। যাদের ওপর মাথা রেখেছি, অঙ্গ প্রসারিত করেছি, তারা যদি নীরবে নেপথ্যে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে তা হলে—তা হলে কি হতে পারে বল তো? ওদের দাঁত কিম্বা নখ নেই যে আঁচড়ে কামড়ে দেবে, বড় জোর, গরম হয়ে উঠতে পারে। তাতে খারাপ না হয়ে ভালই হবে এই শীতকালে। কিন্তু ওরা আমার মনের কথাটা বুঝবে না এই বা আমি ধরে নিচ্ছি কেন। হয়তো সব বুঝছে এবং নিজেদের ভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করছে, আমি বুঝতে পারছি না। সবই সম্ভব, মানে কল্পনায়।

.... পৃথিবীর গোলমাল থেমেছে। মুখের এবং মনের উপর লৌকিকতার যে ছদ্ম আবরণটুকু ছিল তা সরে গেছে। নির্জ্জন নিশীথে মনের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একাধিক স্তর আছে। এক স্তরে সে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। খায়, বেড়ায়, ঘুমায়, সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করে। অত্যন্ত বাস্তব। অন্য স্তরে সে কিন্তু খুবই অসাধারণ। সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। তার কল্পনা, তার স্বপ্ন একান্তভাবে তার নিজস্ব। সেখানে কারও সঙ্গে তার মিল নেই। সেই অসাধারণ বেখাপ্পা কল্পনাকে সে মূর্ত্তও দেখতে চায় বাস্তব জীবনে এবং সেইখানেই বাধে বিরোধ। বিরোধ বাধলেই সে কিন্তু থেমে যায় না, কারণ তার স্বপ্নজীবনকে বাস্তবে রূপ দেওয়াটাই তার মনুষ্যত্ব, বৈশিষ্ট। তাই কখন চুপি চুপি, কখন সোরগোল করে' প্রত্যেক মানুষই ওকাজ করেছে। স্বপ্নকে বাস্তবে যারা রূপ দিতে পেরেছে জীবনে তারাই সুখী, তারাই কৃতী। যারা পারেনি, তারা দুঃখী, জীবন তাদের অধন্য। অধিকাংশ লোকই কিন্তু

পারে না। টাকা রোজগার করতে পারে, খ্যাতির শিখরে উঠতে পারে, কিন্তু স্বপ্নকে রূপ দিতে পারে না। তাই বোধ হয় অধিকাংশ লোকই অসুখী।

সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল—সে ভদ্রকন্যার কাল্পনিক জগতের স্বামী ছিলেন সুশ্রী, সুধী, সুগায়ক। বাস্তব জীবনে হয়েছে কিন্তু তার বিপরীত। বাস্তব স্বামীর না আছে শ্রী, না আছে ধী, না আছে গান। ভদ্রমহিলার মনোকষ্টের অবধি নেই। কষ্ট তো হবেই। নিজের কল্পনা অপরের মধ্যে ষোলআনা সফল হবে এটা আশা করা অন্যায়, কারণ উক্ত 'অপর' ব্যক্তিরও নিজস্ব একটা সত্তা আছে তো!

জীবনে অহরহই এ রকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি চিরকালই কাল্পনিক। কত কল্পনাই করি। অধিকাংশ কল্পনাই সফল হয় না। হঠাৎ একটা কল্পনা মূর্ত্তিমতী হয়েছে মনে হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে, পাছে 'উবে' যায়! এ পৃথিবীতে যা-কিছু সুন্দর তাই নাকি ক্ষণভঙ্গুর। ভারী ভয় হয় তাই। তুমি 'কডলিভার' কিনেছ তো? যা বলে' এসেছি কোরো ঠিক ঠিক। অতুল গলায় লাগাবার ওষুধটা দিয়ে গেছে আশা করি। লাগিও ঠিক মত। এতে লজ্জার কি আছে? অসুখ হয়েছে ওষুধ দিচ্ছ, শখ তো আর নয়।

এখন এত ইচ্ছে করছে তোমায় কাছে পেতে। কোলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ কি আর এমন দূর? এস না চলে' মনোরথে চড়ে' স্বপ্নকে সারথি করে'। রূপকথায় যা সম্ভব, বাস্তব জীবনে তা অসম্ভব কেন? সত্যি কি মজাই হয় হঠাৎ যদি এসে শুয়ে পড় পাশটিতে, কম্বলে কুট কুট করবে যদিও তোমার, তবু ভাল লাগবে।

কত কি লিখতে ইচ্ছে করছে। সেই মেয়েটি জানলার ছোট্ট ফুটোতে চোখ রেখে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হাসছে মুচকি মুচকি। সেই মেয়েটি যার কথা বলব না বলেছি।.... এবার আসি।

রাত্রি একটা বাজে। হাসি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় এখন! তার শুক্‌নো বিষণ্ণ মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। বোর্ডিংয়ে যাওয়ার কতদূর কি হোলো জানিও। উঃ অনেক রাত হ'ল—আসি এবার। ডট ডট ডট। অর্থাৎ ....

অসিত

৬

২৫-২-৪৯

কাল তোমার পোস্টকার্ড এবং আজ তোমাব খাম পেলাম। পোস্ট-কার্ড পেয়ে হতাশ হয়েছিলাম, খাম পেয়ে তবু খানিকটা খুশি হলাম, অবশ্য অতি অল্পই। চার পৃষ্ঠায় আর কত কি লেখা যায় বল। কবিতায় চিঠি লিখতে মানা করেছ কেন। সময় নষ্ট হবে? সময় তো নষ্ট করবার জন্যেই, পয়সা যেমন খরচ করবার জন্যেই। বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই, শেষ পর্য্যন্ত বাঁচানো যায়ও না।

বোর্ডিংএ স্থান পেয়েছ জেনে আশ্বস্ত হলাম। মন দিয়ে লেখাপড়া কর এবার। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের উপদেশগুলো ঝালিয়ে নাও আর একবার। এত কাণ্ড করার পর ফেল হলে সে ভারী বিশ্রী হবে। আমি ফেল করতে পারি এবং আমার ফেল করবার সঙ্গত কারণও আছে একাধিক। প্রথম কবিতা, দ্বিতীয় তুমি, তৃতীয় ড্যাশ, চতুর্থ ডট্, ডট্ এবং ইত্যাদি এটসেটরা অনেক আছে। আমি তোমায় ফেল করাব? সে রকম ভাগ্য আমার নয়। তুমি পাশ করবেই জানি, তবু স্বামী হিসেবে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য তাই একটু দিলাম। মেয়েরা কখনও ফেল করে না। পরীক্ষায় নম্বর পাবার নানা কৌশল তাদের আয়ত্তাধীন। নানাদিক বাঁচিয়ে সংসার-সমুদ্রে পানসিটুকু মাত্র সম্বল

করে যারা পাড়ি জমাতে পারে তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। যে সব মেয়ে ফেল করে তারা মেয়ে নয়, তাদের মধ্যে পুরুষ উহ্য হয়ে আছে জানবে।

তুমি আমাকে যে পরিমাণ বিরক্ত করছ তার সিকির সিকিও আমি তোমাকে করি না নিশ্চয়। কাল কি কাণ্ড করেছ জান? কাল যখন পড়ছিলাম (খুব বীভৎস জিনিসই পড়ছিলাম, একটা মড়া কেমন করে পচে পচে অবশেষে কদাকার দুর্গন্ধ গলিত পিণ্ডে পরিণত হয় তারই বিশদ বর্ণনা) তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতার মিল খুঁজছি। যে কবিতা কাল তোমায় লিখে পাঠাব সেই কবিতার! গলিত মাংসপিণ্ডের উপর ভেসে উঠছে হাসিভরা তোমার চোখ দুটি। বারম্বার এই কাণ্ড। কতবার ঠিক গুণিনি কিন্তু অনেকবার।

বিরক্ত হয়ে শেষে প্যাথোলজি নিয়ে বসলাম, সেখানেও দেখি তুমি হানা দিয়েছ। এবং বেশ একটু বিচিত্র রকমে। একরকম পোকার কথা পড়ছিলাম, নাম তাদের সিস্টোশোমাম্ (Schistossomum), এরা যতদিন বড় না হয় ততদিন আলাদা আলাদা থাকে। কিন্তু যখন সাবালক হয় অমনি পুরুষদের পেটের তলায় খাঁজ হয় আর মেয়ে লোকটি সেই খাঁজে ঢুকে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং এই ভাবেই বরাবর থাকে। এরা দেখতে খুব ছোট ছোট কেঁচোর মতো। এই প্রেমিক পোকাদের বাস মানুষের রক্তে, কখনও বা শামুকের পেটে। যে মানুষের রক্তে এরা সঞ্চরণ করে রক্তপ্রস্রাব করতে করতে ইহলীলা সম্বরণ করতে হয় সে বেচারাকে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আহা আমরা মানুষ না হয়ে যদি ওই রকম পোকা হতুম, বেশ হ'ত তা হলে। মন কেমন-করা প্রভৃতির কোন উৎপাত থাকত না। বোঝ! পোকা হতে ইচ্ছে করছিল। ····এমনি করে বিরক্ত করবে নাকি তুমি আমাকে! কি কাণ্ড! সামনে 'ফোটোতে বসে বসে' সমানে যে হেসে যাচ্ছ মুচকি মুচকি! ···· অবিলম্বে চিঠির উত্তর যদি না দাও,

ফের চলে যাব বলছি! তোমার মন খারাপ লাগে, আর আমিই বুঝি পাষাণ?

অতুল এক শিশি লজেন্‌জ দিয়ে গেছে তোমাকে? বেশ তো, খেয়ে ফেল। চুষে চুষে খেও, লজেন্‌জ গিলে খেতে নেই, গলায় আটকে যেতে পারে।

অতুলের জন্য দুঃখ হয় বড়। রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, কোটরগত চক্ষু, মাথায় নানাবিধ 'ইজমে'র আগুন, পেটে খিদে।

বিবিধ সমস্যায় আকুল বেচারা! অথচ, একটাও সমাধান করবার সামর্থ্য নেই। অথচ গান গাইতে পারে, ভালো ছবি তুলতে পারে, লিখতেও পারে, পেটে বিদ্যেও আছে, তবু কিছু করতে পারছে না। কেন জান? চরিত্র নেই। তাজমহল গড়বার সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে আছে, নেই কেবল সিমেণ্ট জাতীয় জিনিস যা সমস্ত জিনিসটাকে গড়ে তোলে, ধরে রাখে। কথার ঠিক নেই, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হরদম করে চলেছে, সংযম নেই, মাত্রা-বোধ নেই। সুতরাং কষ্ট পাচ্ছে। সত্যি বড় দুঃখ হয় ওঁর জন্য। .... কিন্তু এ আমি করছি কি! দুটো বাজে। সুতরাং ইতি এবং—।

অসিত

৭

২৬-২-৪৯

পদ্য ক'রে পত্র লেখা নয়কো তত মন্দ কাজ
ভদ্রভাবে ভাষার গায়ে পরিয়ে দিলে ছন্দ সাজ
একটু যেন ভালই লাগে, করছি নাকো অহঙ্কার,
দেখায় না কি তোমায় ভালো পরলে কিছু অলঙ্কার?

ছন্দধারা তৃপ্ত করে নন্দনিয়া কর্ণমূল
যেমন আঁখি তৃপ্ত করে তোমায় দুটি স্বর্ণ-দুল।
বলতে পারো—'পরীক্ষা যে'—সত্যি কথা, জানছি সব
সময় কিছু নষ্ট হবে—হবেই হবে—মানছি সব।
যুগের শেষে কিন্তু সখি আসবে জেনো যুগান্তর
নষ্ট কিছু হয় কি কভু ? হয়তো শুধু রূপান্তর।
মনের মাঝে পাগল আছে খেয়াল হল আজকে তার
হঠাৎ মোরে বলছে এসে, কেতাব রাখ বাঁধ সেতার।
ছন্দ-ভরে মেলছে পাখা আজকে মন-পক্ষী মোর।
রাগ কোরো না, রাগ কোবো না, রাগ কোরো না লক্ষ্মী মোর।
এতটা কাল বাস করেছি গহন বনে পুস্তকের
কল্পলোকে ছিলাম নিয়ে অসুস্থ ও সুস্থদের,
মধ্যে মাঝে সময় পেলে নানা রকম পত্রিকায়
খেয়াল খুশি যেতাম নিয়ে ছন্দ-ভরা ছত্রিকায়।
খুশির করতালের সাথে বাজিয়ে নিজ ছন্দ বীণ
স্বপ্ন-মেঘ-মালার দেশে যেতাম ভেসে বন্ধহীন।
হৃদয়-নিয়ে চর্চ্চা কত করেছিলাম কল্পনায়
অলস-নিশি স্বপ্নঘোরে জ্যোৎস্নাময়ী জল্পনায়।
এসেও ছিল বস্তু কিছু ওজনদরে কয়েক মণ।
গয়না-টাকা-রূপের-বোঝা-সমন্বিতা কয়েকজন
সেমিজ-শাড়ী-ব্লাউস-পরা পায়ে রঙীন অলক্তক,
(রঙীন জুতা কিম্বা কারও) নখের থেকে অলক্তক্
সবই ছিল যেমন থাকে মুখোশ-পরা নকল মুখ
চোলাই করা মিষ্টি হাসি ঢালাই করা পাষাণ বুক।
রুগ্ন মোটা শুক্‌নো তাজা উর্ব্বশী ও রম্ভাগণ
এসেছিলেন হেসে হেসে করেছিলেন সম্ভাষণ।

ভেবেছিলাম এ সব নিয়ে বীণার তারে তুলবো তান
এমন সময় হঠাৎ তুমি মাল্য দিলে মূল্যবান।
আচম্বিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফাল্গুনেরি লগ্ন মোর
মূর্ত্ত হ'ল, সফল হল এতকালের স্বপ্ন মোর!
শেষকালেতে বিয়েই হ'ল (উলু দেওয়া হিন্দু মত!)
লজ্জাভরে সবান্ধবে হয়ে গেলাম বিন্দুবৎ।
লক্ষ্ণৌ তো নিঝুম এখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—
আকাশ-ভরা কাজল মেঘে সবার ঘরে বন্ধদ্বার।
ভাবছি বসে' একলা ঘরে (ভাবলে সময় নষ্ট হয়?)
ভাবছি বসে অনেক যা-তা নিজের কাছেই পষ্ট নয়।
ভাবছি অনেক ভাববো আরো—স্বপ্নভরা চিন্তা জাল
(সকাল সকাল ভোরে আবার উঠতে হবে কিন্তু কাল)
রঙিন কথা সঙীন কথা অনেক কথা অবান্তর
লিখতে পারি, লিখবো নাকো ঘটবে শেষে মনান্তর?
ছন্দে যাহা মিলছে নাকো গদ্যে সেটা করছি পেশ
মিল মিলিয়ে লিখতে গেলে আজকে হবে রাত্রি শেষ।

অর্থাৎ—রোজ কডলিভার অয়েল খেও।
রোজ ডিম খেও।
রোজ টন্‌সিলে ওষুধ দিও।
নিয়মিত চিঠি লিখো।

অসিত

৮

৩-৩-৪৯

তোমার চিঠি পেলাম। মানে, পেয়েই উত্তর দিতে বসেছি। আচ্ছা, সত্যি করে' বল তো কে বেশি চিঠি লিখেছে। আমি তো আজ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচখানি চিঠি পেয়েছি তোমার। গুনে দেখো। অনেক বেশি লিখেছি। নিশ্চয়ই। তুমি যখন নিজে চিঠি না লিখে চুপচাপ বসে থাক তখন বুঝি এসব কথা মনে থাকে না। নিজের বেলায় আঁটিসাটি। আমার চিঠি লিখতে একদিন দেরি হয়েছে অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অস্থির। বেশ তোমরা।

তোমায় বিয়ে ক'রে আমি অনুতপ্ত কি না জানতে চেয়েছ। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কোরো ঠিক জবাব পেয়ে যাবে। এত দুষ্টু কেন তুমি? আমার মনে কষ্ট দিলে বেশ একটু তৃপ্তি পাও বোধ হয়। তা না হলে এরকম কটু কথা লিখতে না।

তোমার গলার ঘা সারছে না কেন? হোস্টেলের ডাক্তারকে দেখাও। গরম জলে নুন বা ফটকিরি দিয়ে গার্গল কোরো রোজ। লিষ্টারিন ব্যবহার করতে পার। আশা করি, 'কডলিভার অয়েল' খাচ্ছ। প্যারগেটিভও নিও মাঝে মাঝে। সকাল বেলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেলো রোজ খালি পেটে।

ডাক্তারি কথা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছ, নয়? কিন্তু গলায় ঘা থাকলে কত রকম বিপদ হতে পারে এ কথা তোমার যদি জানা থাকত এবং তোমার একমাত্র বউটির যদি গলায় ঘা থাকত এবং তিনি যদি বোর্ডিং-বাসিনী হতেন তা হলে তুমিও এই করতে। এর চেয়ে অনেক বেশি করতে। দু'দিন চিঠি না পেয়েই মেজাজ যা গরম হয়েছে তার থেকেই বুঝতে পারছি। চিঠি তো নয় যেন একটুকরো 'লু'!

আজ তোমার ঝুনু মাসীর চিঠি পেলাম। অনেক ঠাট্টা করেছে। আমার সব চিঠিগুলো তাকে দেখিয়েছ? স—ব? আচ্ছা, কি ভাবলে সে। তোমার কলেজের বান্ধবীরা চিঠি দেখেন না কি? আমার কোন আপত্তি নেই যদি তোমার লজ্জা না করে, পুরুষরাই নির্লজ্জ শুনেছি। আমি কিন্তু তোমার চিঠি দেখাতে পারব না কাউকে। এমন কি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না।

আমাকে এইবার উঠতে হবে। তুমি হপ্তায় ক'খানা চিঠি পেলে খুশি থাকবে জানিও আমায়। তুমিও উত্তর দেবে তো? মুচকি মুচকি হাসছ দেখতে পাচ্ছি। না, তুমি না লিখলে আমি লিখব না।

হঠাৎ সত্যেন দত্তর একটা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল। কবিতাটার নাম 'সাড়ে চুয়াত্তর'। "একটি তোমার চুমার লাগি পরাণ কাঁদে হায়।" ইতি—

অসিত

৯

৪-৩-৪৯

ভাই অসিত,

কাল তোমার স্ত্রী শ্রীমতী হাসির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছি হোস্টেলে গিয়ে। সিনেমায় ভাল একটা বই হচ্ছে, নিয়ে যেতে চাইলাম, রাজী হল না। এর আগের দিনেও ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম গলাটা দেখাবার জন্যে, যেতে চায় নি। কেন যেতে চাইছে না জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না, চোখ নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসে খালি। অথচ দেখ—না থাক—তোমার

সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কত ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে তোমার কাছে অদ্ভুত বক্তৃতা করতে চাই না। উইল ইউ প্লীজ ডু ওয়ান থিং? তোমার তো লেখবার শক্তি আছে জানি (যদিও তা কারো মত পরিবর্ত্তন করতে পারে কি না এ প্রমাণ এখনও পাই নি) সে শক্তিটা তোমার বিবাহিতা পত্নীর উপর প্রয়োগ ক'রে দেখতে পার? আমি যে বাঘ ভাল্লুক গণ্ডার জাতীয় কোনও হিংস্র প্রাণী নই, আমি যে বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত যুবক একজন এবং সর্ব্বোপরি তোমার বন্ধু, এ কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবে কি? অবশ্য যে পারিপার্শ্বিকে তুমি তাকে ফেলেছ সেখানে যদি শান্তি রক্ষা ক'রে চলতে হয়, তা হলে হাসি যে রাস্তা ধরেছে তাই একমাত্র রাস্তা। ও ইয়েস! ওই শ্লেট-মাসীমা-দারোয়ান—হেল! ওরকম পরিস্থিতিতে মনে যাই থাক, বাইরে চোখ নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে 'না' বলা ছাড়া উপায় নেই। এর প্রতিকার একমাত্র তুমিই করতে পার, কারণ তুমি তার স্বামী—লিগাল হাস্‌বাণ্ড। উইল ইউ প্লীজ ট্রাই? তোমাদের ফোটো এখনও হয় নি। হলেই পাবে। ইতি—

অতুল

১০

অতুল ডাক-যোগে তোমার কাছেও হানা দিয়েছে নাকি? আমিও তার চিঠি পেয়েছি একটা। উত্তরও দিয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু আধটু বেরোতে চায়! যাওয়া না যাওয়া অবশ্য তোমার ইচ্ছা। আমি কোন আপত্তি বা অনুরোধ করছি না। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর শ্রদ্ধাটা আমার আন্তরিক। মৌখিক নয়। কার সঙ্গে তুমি কথা বলবে, কার সঙ্গে বেড়াবে, কি পাড়ের শাড়ী বা কোন্ ছিটের জামা পরবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার

ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। চিঠির উত্তর দিও তাকে। যা লিখবে ভেবে-চিন্তে সাবধানে লিখ। কারণ লোকটি একটু বাঁকা ধরনের, সহজ কথা সহজ ভাবে নিতে পারে না। মহেন্দ্র ঠিক একেবারে উল্‌টো। মহেন্দ্র কি এসেছিল তোমার কাছে? আসবে ঠিক একদিন। মহেন্দ্রর বউ চিত্রা সেদিন চিঠি লিখেছিল একটা। লিখেছিল, "উনি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে' হাসির খোঁজ নিতে পারেন নি। সময় পেলেই যাবেন।" আসবে একদিন ঠিক। মহেন্দ্র অতুলের ঠিক উল্‌টো। অতুলের নিন্দা করছি না আমি, ও কি রকম তাই শুধু বলছি। তা বলে তুমি যেন ওর সঙ্গে অভদ্রতা করো না। সুসঙ্গত শিষ্টাচার সকলেরই প্রাপ্য।

কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না। সারা দিন-রাত শুয়েই কেটেছে। একবার তোমাকে চিঠি লিখব ভাবলাম। কিন্তু তোমার চিঠি এল না বলে' লিখলাম না। গত বৃহস্পতিবার চিঠি পেয়েছি তোমার। আজ রবিবার। এ অবস্থায় শ্রীমতী হাসি একদা যা লিখেছিল তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—"এখনও কোন চিঠি লিখলে না কেন। ইচ্ছে করে না বুঝি। এর মধ্যেই ভুলে গেলে? .... চিঠি না পেলে ভয়ানক মন খারাপ লাগে, পড়াশোনা মোটেই হবে না তা হলে বলে দিচ্ছি .... যদি লিখতে ভাল না লাগে তবে লেখবার দরকার নেই। মিছি-মিছি একজনকে বিরক্ত করতে চাই না। তুমি যাতে শান্তিতে থাক আমার তাই করা উচিত। দুঃখ তো দিতে চাই না। কেমন আছ। শরীর ভাল আছে তো? খাওয়ার কোনও অযত্ন কোরো না, তা হলে আমি দুঃখিত হব। চিঠি লিখ লক্ষ্মীটি। বিয়ে যখন করেছ আমার মতো বিশ্রী লোককে, দুঃখ করে' আর কি করবে বল। গতস্য শোচনা নাস্তি। .... সত্যি ক'রে লিখো তো আমাকে পেয়ে তোমার অনুতাপ হয়েছে কিনা। .... ভয়ানক খারাপ লাগে।"

অসিত

১১

৫-৩-৪৯

এইমাত্র লাইব্রেরী থেকে ফিরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার কাশি সারছে না কেন? বড় চিন্তার কারণ হল তো'। তুমি অতুলের সঙ্গে যাও না হয় একদিন ডাক্তার বাবুর কাছে। গলাটা দেখিয়ে এস। আমি রোজ রাত জেগে পড়ি এ খবর কে দিলে তোমাকে? ঠাকুরপোরা? তা পড়ি। না পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। দিনের বেলায় পরীক্ষার পড়া পড়ি। রাত্রে পড়ি নিজের পড়া। কিন্তু তোমার কাশি সারছে-না কেন বল ত? কড-লিভার অয়েল খাচ্ছ কি না?

কলেজের ঘণ্টা পড়ে গেল, চললুম ক্লাসে। বেশি কিছু লেখা হ'ল না আজ।

অসিত

১২

১০-৩-৪৯

উপর্য্যুপরি তোমার দুটো চিঠি পেলাম। ভারী বদান্য, যে। কাশি সেরেছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম না কিন্তু। মনে হচ্ছে, আমাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যেই তুমি ও-কথা লিখেছ বোধ হয়। টনসিল অত সহজে সারে না। অতুলের সঙ্গে ডাক্তার বসুর ওখানে যাওয়াটা এড়াবার জন্যেই এ কৌশল করলে না কি? অতুল ফোটো দিয়ে গেছে জেনে সুখী হলাম। ফোটো সম্বন্ধে মেয়েদের মতামত ওরকম তো হবেই। মেয়েরা পুরুষদের সুন্দর

দেখে আর পুরুষরা মেয়েদের সুন্দর দেখে—এই তো চিরন্তন নিয়ম। অন্যরকম হলেই আশ্চর্য্য হতুম। আশ্চর্য্য হয়েছি কিন্তু আর একটা ব্যাপারে। আমার এই কড়া-পড়া লম্বা পায়ে এমন কি 'শ্রী' হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে একেবারে শ্রীযুক্ত ক'রে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ ক'রে বসেছ। বরং তোমাদের পায়ের শ্রী আছে। আল্‌তা-পরা নূপুর-বাজা নাগরা-ঢাকা সুশ্রী সুন্দর সুকোমল, জয়দেবের ভাষায় 'পদপল্লব-মুদারম্‌'। আমাদের শ্রীহীন পা'কে শ্রীচরণ বললে উপহাসের মতো শুনতে হয়। নিজেদের পা দু'টি না হয় চরণারবিন্দ, তা ব'লে আমাদের পা নিয়ে ঠাট্টা করবে? অত অহঙ্কার ভাল নয়।

আচ্ছা, অতুলের ব্যাপারে অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? তোমাকে সাবধানে চিঠি লিখতে বলেছি বলে' এমন কিছু ইঙ্গিত করিনি যে তুমি ইতিপূর্ব্বে তাকে অসাবধানে চিঠি লিখেছ। চিঠি লিখেছ কি না তাও তো জানি না। তুমি লিখেছ—'আমি তোমার কোনও বন্ধুদের মাঝখানে থাকতে চাই না' কিন্তু আমার কোন বন্ধু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের মাঝখানে এসে পড়তে চায় তা হলে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাকে যদি প্রশ্রয় দিতে না চাও তা হলেও তো ভদ্রভাবে সেটাকে দাঁড় করাতে হবে। একেবারে জিভ কেটে ঘোমটা টেনে দাঁড়াও যদি তা হলে ভারী হাস্যকর হবে যে। দু-চারটে কথার পর একটি ছোট্ট নমস্কার ক'রে বলতে হবে—"আপনি আসাতে খু-উ-ব খুশি হয়েছি! কিন্তু এখন তো বসতে পাচ্ছি না বেশিক্ষণ। কাজ আছে একটু। আচ্ছা নমস্কার"—এই হল কায়দা। আমিই বা অতুলকে কি বলে' বলি হাসি তোমাকে পছন্দ করছে না, অতএব তফাৎ যাও। সে আমি পারব না। এখন সাতটা বাজতে কুড়ি মিনিট। আমার সাতটার সময় একজনের সঙ্গে পড়তে যাবার কথা। উঠছি এখন। আজ রাত্রে এসে শেষ করব চিঠিখানা।

.... পড়া শেষ ক'রে ফিরে এলাম। সাড়ে ন'টা বেজেছে। এখুনি খেতে হবে। অতুলের কথা হচ্ছিল তো? সেইটে শেষ করে দি। অর্থাৎ বক্তৃতা দেব। প্রস্তুত হও। আগের একটা চিঠিতে দিয়েওছি কিঞ্চিৎ। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাকে ভুল বুঝো না। যার সঙ্গে খুশি তোমার আলাপ করতে পার (সে আমার বন্ধু শত্রু যাই হোক), আমি আপত্তি করব না একটুও। আমি তো কত লোকের সঙ্গে আলাপ করি, তুমি তো আপত্তি কর না। তুমিও যেমন আমাকে বিশ্বাস কর, আমিও তেমনি তোমাকে বিশ্বাস করি। কোন রকম জবরদস্তি চালাবার ইচ্ছে নেই তোমার উপর! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার রুচি শোভন হবে বলেই আশা করি। শিক্ষার দরকার তো ঐখানেই। পৃথিবীতে বাস করতে গেলে সব রকম জীবের সংস্পর্শে আসতেই হবে। তাব মধ্যে ভালো, মন্দ, কিছুভাল, কিছুমন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করি শিক্ষার সাহায্যে। তুমি যখন শিক্ষাবর্ম্মাবৃত (বৃতা?) তখন রণস্থলে যেতে ভয় পাও কেন? নেহাৎই যদি ভয় হয়, সঙ্গে তো আমি আছিই, কেউ বলাৎকার করলে রক্ষা করব। আমার তূণে বাণও আছে, বাহুতে শক্তিও আছে। সুতরাং মা ভৈঃ।

১৩

কলিকাতা

১১ই মার্চ্চ, ১৯৪৯

ভাই অসিতবরণ,

গতকল্য তোমার স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে চিত্রাকে লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপিস হইতেই পাড়ি দিয়াছিলাম.

বলিয়া তাহা আর হইয়া উঠে নাই। একটা কাণ্ড করিয়াছি। চিত্রা আপিসে আমার খাওয়ার জন্য গোটা দুই মুড়ির লাড়ু ও কয়েকটা পিঠা দিয়াছিল। সেগুলি তোমার বউকে দিয়া আসিয়াছি। শুধু হাতে যাইতে মন সরিল না। তোমার স্ত্রীকে একটু রোগা দেখিলাম। খুস খুস কাশিও আছে। এ সব খবর তুমি নিশ্চয় জান। ব্যবস্থা নিশ্চয় করিয়াছ। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তোমার স্ত্রীটি একটু বেশি লাজুক দেখিলাম। কলেজে-পড়া মেয়ে আর একটু 'ডাঁটো' হইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে লজ্জাবতী লতাকেও হার মানাইয়া দেয়। আমাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। যদি যায় চিত্রা নিজে আসিয়া লইয়া যাইবে। তোমার আশা করি আপত্তি নাই। তোমার যে আপত্তি নাই এই মর্ম্মে তুমি হাসিকে এবং হোস্টেলের লেডি সুপারিনটেণ্ডেটকে পত্র দিও। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

মহেন্দ্র

১৪

১২-৩-৪৯

তুমি হয়তো ভাবছ আমি রাগ করি নি। তবে তোমার চিঠির কয়েকটা কথায় একটু ব্যথা পেয়েছি বই কি। রাগ আর ব্যথা ঠিক এক জিনিস নয়

তুমি লিখেছিলে—"মহেন্দ্রের বাড়ী আমি যাব না এ কথা বলার যদিও আমার 'রাইট' নেই কিন্তু এটা বোধ হয় বলতে পারি তার বাড়ীতে আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে নেই।"

উপরোক্ত বাক্যটি লিখে তুমি আমাকে এবং নিজেকে উভয়কেই অবনত করেছ। নিজেকে করেছ এই হিসেবে যে, যা করবার ইচ্ছে নেই তা জোর করে' বলবার 'রাইট'ও নেই যেন তোমার। অর্থাৎ তুমি যেন সর্ব্বতোভাবে দাসী। আর আমাকে ছোট করেছ এই হিসেবে, যেন আমি তোমাকে বিয়ে করে, তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করে' বসে আছি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই?

মহেন্দ্র নানাদিক দিয়ে হয়তো সভ্য সমাজের অনুপযুক্ত। তার না আছে রূপ, না আছে অর্থ, না আছে বিদ্যা। মাট্রিকুলেশন পাশ কেরানী মাত্র সে। কিন্তু তার যে জিনিসটার পরিচয় আমি পেয়েছি তা তার হৃদয়। অতবড় হৃদয়বান লোক বড়-একটা দেখিনি। অনেক দুঃখের দিনে অনেক বেদনাময় সন্ধ্যা-প্রভাতে তার যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা তুমি করনি। তোমার যদি করবার ইচ্ছে না থাকে কোরো না। এতে আমার রাগ বা দুঃখ হবে কেন? তুমি যে পরিবারে মানুষ এবং তদনুসারে তোমার মানসিক গঠন যে প্রকার হয়েছে তাতে মহেন্দ্রদের সঙ্গে তোমার হয়তো খাপ খাবে না। চিত্রার খাচ্ছে না। সে বড়লোকের মেয়ে। মহেন্দ্রদের বাড়ীর দারিদ্র্যজনিত অনিবার্য্য নোংরামি সে সইতে পারছে না। এবং এই নিতান্ত বাহ্যিক কারণে তার অসহিষ্ণুতা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, আসল মহেন্দ্রকে ও চিনতেই পারবে না হয়তো কখনও। জ্বলন্ত ঘুঁটের ভিতরও যে খাঁটি আগুন আছে এ খবর হয়তো কোন দিনই পৌঁছাবে না ওর কাছে। ধোঁয়াকে গাল পাড়তে পাড়তেই ওর জীবন কাটবে।

আমার কি মনে হয় জান? পৃথিবীতে যত খাপ খাইয়ে চলতে পার ততই সুবিধা। ইচ্ছা এবং উদারতা থাকলে সর্ব্বস্থানেই নিজের একটা আসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন কি মহেন্দ্রের বাড়ীতেও।

অবশ্য ইচ্ছা থাকা চাই। তোমার যখন সেইটেরই অভাব তখন আর কথা কি।

'ফিলজফি' তুমি বুঝতে পারছ না? লতিকার দাদা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চান? বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। লতিকা আর তুমি এক ঘরেই থাক? তা হলে তো তিনি আমার সতীন! লতিকার দাদার চরিত্র কতটা বিশুদ্ধ তা নিয়ে অত লম্বা বক্তৃতা করার কোন দরকার ছিল না। তাঁর কাছে পড়তে যদি তোমার নিজের আপত্তি না থাকে আমার আপত্তি নেই। আমি তোমাদের মাসীমাকে চিঠি দিয়ে দিলাম এই সঙ্গে, তিনি যেন তোমাকে বিজয়বাবুর কাছে পড়তে দেন।

দেখ, বাইরে তুমি যত লোকের সঙ্গেই মেশ না কেন আমার কিচ্ছু ভয় নেই কেন জান? আমি নিশ্চিন্ত আছি যে। যে অন্তরের অমরাবতী তুমি আলো করে' আছ সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা। সেখানে একাকিনী অন্তঃপুরিকা তুমি। আর কেউ নেই, কেবল তুমি আর আমি। তাই আমার কোন ভাবনা নেই। এত সাহস আছে তোমার?

এর পর 'চুমু নাও'টা বড় খেলো শোনাবে তাই আর লিখলাম না। ইতি—

অসিত

১৫

১৪-৩-৪৯

ভাই অসিত,

তুমি খবরের কাগজের যে 'কাটিং'টা পাঠিয়েছিলে তা দেখে দরখাস্ত করেছিলাম একটা তোমার অনুরোধে। ফল কি হয়েছে শোন। সে যুগে কুলীন ব্রাহ্মণরা যেমন পৈতেটা আস্ফালন করত

এ যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা তেমনি ডিগ্রীটা আস্ফালন করি। আমার মনের কথা যদি শুনতে চাও আমার লজ্জা করেছিল ওগুলো পাঠাতে। তবু তোমার অনুরোধেই পাঠিয়েছিলাম। 'ইণ্টারভিউ' করবার আহ্বান এল। গেলাম। কি জিজ্ঞাসা করলে জান ? আমার বংশ-পরিচয়। অর্থাৎ শুধু ডিগ্রী থাকলেই চলবে না, পেডিগ্রীও চাই আমরা পেডিগ্রী দেখে জামাই করব, কুকুর পুষব কেরানীও রাখব। আমার পেডিগ্রী নেই, সুতরাং আমার হল না। আমাকে এই অপমান-জনক অবস্থায় ফেলেছিলে বলে' আই কার্স ইউ। প্রাইভেট ট্যুশনি ক'রে দোকানের বিজ্ঞাপন লিখে বেশ তো চলছিল আমার। একটা পেট চালিয়ে নিতাম এবং নেবও কোনক্রমে। একাধিক উদরের চিন্তা ইহজীবনে করবার আর সম্ভাবনা নেই। যখন অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণ ছিলাম, যখন নব-বধূর কল্পনা-বিলাসে সমস্ত মন মেতে উঠত, তখন বহু নির্ব্বাচনের পর যে মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল তাকে আমি পাইনি। বাদ সেধেছিল কুষ্ঠি। অর্থাৎ সে-ও এক রকম পেডিগ্রী, অদৃশ্য পেডিগ্রী, যার উপর আমার কোন হাত নেই, আমার পুরুষকার বিচলিত করতে পারে না যাকে, অথচ যা আমার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করে' চলেছে! উঃ কি দেশেই জন্মেছি! কবির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'ক তুমি!'

আর একটা কথা। তোমার বউ কিছুতে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে যেতে রাজী নয়। তুমি যে তাকে যেতে বলেছ এ কথাও তার মুখে শুনলাম। এর পর আর কি করা যায় বল! ডাক্তার বোসের সঙ্গে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি হোস্টেলে গিয়েই হাসির গলাটা দেখে আসবেন—ও ইয়েস, বললে, নিশ্চয়ই আসবেন—কিন্তু তাঁকে অনুরোধ করব কি না ভাবছি। তোমার বউ আমার সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যহার করেছে তার সিকির সিকিও

যদি ডাক্তার বোসের সঙ্গে করে মর্ম্মান্তিক হবে সেটা আমার পক্ষে। তোমার চিঠিতে যদি ভরসা পাই যে, হাসি ভদ্রভাবে ডাক্তার বন্ধুকে তার গলাটা দেখাবে, তা হলে হোস্টেলেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করব তাঁকে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না, অবশ্য যদি উত্তর দেওয়ার মতো কিছু থাকে তোমার। হোয়াট আই মীন ইজ দিস্—এটা মনে কোরো না যেন যে আমি তোমাকে উত্তর দিতে বাধ্য করছি। তোমার যদি নিজের উত্তর দেওয়ার তাগিদ না থাকে দিও না। ইতি—

অতুল

১৬

১৬-৩-৪৯

তোমাকে গত চিঠিতে অনেক বাজে কথা লিখেছি বলে আমি লজ্জিত, নির্জ্জন ঘরে বসে যা মনে এল লিখে গেলাম অনর্গল। কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি। তুমিও তো কম বাজে কথা লেখনি। আচ্ছা, তুমি বার বার লেখ কেন বল তো যে, তোমার রূপগুণ কিছু নেই। তোমার রূপ যে কত তা তোমাকে বোঝাব কি করে। মৈমনসিংয়ের এক গ্রাম্য কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—আমার চক্ষু নিয়্যা তুমি নয়ন ভইর‍্যা দেখ। পণের টাকা দাওনি বলে তোমার লজ্জা হয়েছে? তোমার বাবার টাকা নিয়ে বিলেত গেলে আমার গৌরব বাড়ত এই তোমার বিশ্বাস? ছি, ছি, আমাকে তুমি এত ছোট ভাব?

কাল রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম, তুমি যেন খুব কাঁদছ সেই চিঠিটা পড়ে। সত্যি কেঁদেছ না কি। ... ইচ্ছে করছে এ সময় তোমাকে কাছে পেতে। কবে পাব জানি না। পুজোর সময়

সত্যিই এবার যাওয়া হবে না। এই সময় এই নির্জ্জন ঘরে এস না একবার। সত্যি যদি চোখে জল থাকে মুছিয়ে দি।

আমার হাসি—আমার নয় তো কার? আমার—আমার—নিশ্চয় আমার—কারও নয়। সন্দেহ আছে নাকি? তুমিই ভাল করে বলতে পার তুমি আমার কি না। আমার না? আমারই তো। নয় বৈ কি!

মনের ভিতর এত অজস্র কথা রঙীন হয়ে ফুটে উঠছে যে লেখনীর সাধ্য নেই তাদের বর্ণনা করে। লেখনীর মুখে তাদের আনতেও ভয় করে। সস্তা কথার সাজ পরে মানাবে না তাদের। সত্যিই তারা অবর্ণনীয়।

তুমি বর্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেছ। এখানেও বর্ষা নেমেছে বই কি। তুমি 'মেঘদূত' পড়েছ? "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘ-মেদুর অম্বর পরিব্যাপ্ত করে বিরহী কবির যে মর্ম্মবেদনা বাণীমূর্ত্তিতে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল আজ তা আমাকেও পীড়িত করছে। আজ সত্যিই অনুভব করছি মেঘদূত কেন রচিত হয়েছিল।

নাঃ—চিঠিতে এসব কথা লিখতে ভাল লাগছে না। কেন বর্ষার কথা তুলেছ তুমি? নিজে দূরে সরে থেকে বর্ষার বিষয়ে খোঁজ করা হচ্ছে! দুষ্টু। দেখি, মুখ দেখি। হাতটা সারাও না ....।

অসিত

পুনশ্চ। আবার তুমি 'শ্রীচরণেষু' লিখেছ? 'প্রাণেশ্বর' বা 'জীবনবল্লভ' লেখার দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে একেবারে শ্রীচরণেষু! আমার পদযুগলকে পদে পদে এমনভাবে অপদস্থ করবার মানে? সে বেচারারা তো কোন পদবীর প্রত্যাশা করে না। ফের যদি শ্রীচরণেষু লেখ তা হলে সত্যি বলছি আমি মাথা কামিয়ে টিকি রেখে দেব, পাঞ্জাবির বদলে নামাবলী গায়ে দেব এবং প্যাথলজি পড়া ছেড়ে পুরোহিত-দর্পণে মন দেব। ইতি—

অসিত

২-৪-৪৯

কালকের চিঠিতে তোমায় একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। অতুল লিখেছে সে তার একজন বন্ধু ডাক্তার বসুকে তোমার কাছে নিয়ে যাব হোস্টেলে। ডাক্তার বসু একজন থ্রোট স্পেশালিষ্ট। যদি নিয়ে যান গলাটা দেখিও তাঁকে। অভদ্রতা কোরো না যেন। তোমার মাসীমাকেও এই মর্মে চিঠি দিচ্ছি। আচ্ছা হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে তোমরা মাসীমা বল কি করে? লজ্জা করে না। আমাদের সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে মেসোমশায় ব'লে ডাকবার কথা তো ভাবতেই প্যারি না আমরা।

.... হাসি এখন কি করছে? আমার হাসি? এখন সাড়ে দশটা রাত। হস্টেলের আলো নিবে গেছে নিশ্চয়। গল্প করা হচ্ছে, না ঘুম? এখানে এখন কি কাণ্ড হচ্ছে জান? তুমুল কাণ্ড। বৃষ্টি হচ্ছে। খুব আকাশ ডেকে মুষলধারা তা নয়, তবু কিন্তু তুমুল। অবিশ্রান্ত রিম ঝিম শব্দ, ভিজে হাওয়াব ঝাপটায় ছিটকিনিহীন জানলার কপাটটা খুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আর তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তিমিরঅবগুণ্ঠনে ঢাকা বিরহিণীর রূপ, অবলুপ্ত হয়ে গেছে গ্রহ-নক্ষত্র সব, অন্ধকারের বুকে গুমরে উঠছে কান্না। একা ঘরে বসে আছি ....।

একটা মশা এসে ভারি বিরক্ত করে তুলেছে। বার বার তাড়িয়ে দিচ্ছি, তবু বার বার কানের কাছে এসে তান তুলছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের উপরও বসতে চাইছে। 'মশকদূত' পাঠিয়েছ না কি। তোমার ঠোঁট থেকে কিছু চুরি করে এনেছে, আমার ঠোঁটে সেটা রেখে যেতে চায়। যদিও পড়েছি যে মশা এক মাইলের বেশি উড়ে যেতে পারে না, কোলকাতার মশার পক্ষে লক্ষ্ণৌ উড়ে আসা অসম্ভব, তবু

এই অসম্ভবটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ইতি ডট ডট ডট। পুনশ্চ ড্যাশ।—

অসিত

১৮

আজ কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি। আশা করেছিলাম, তোমার চিঠি পাব। বিস্কুটের টিনটি খালি দেখে হতাশ হলাম, একেবারে খালি অবশ্য ছিল না, তোমার বান্ধবী পাখী স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে চিঠি লিখেছেন একটি। বিস্কুটের টিন বুঝতে পারছ না নিশ্চয়। একটি তোবড়ানো বিস্কুটের টিন আমাদের লেটার বক্স। তাতেই পিওন তোমাদের চিঠি দিয়ে যায়। পাখীর সঙ্গে তুমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে সেবার, সেই জোরেই চিঠি লিখেছেন তিনি। স্বল্প পরিচয়ে ঠিক বুঝতে পারিনি ইনি কোন্ জাতের পাখী। পাখী অনেক রকম হয় তো। যথা—শিকারী পাখী (বাজ), বাহারে পাখী (হীরামন), বাচাল পাখী (কাকাতুয়া), গায়ক পাখী (শ্যামা, দোয়েল), দুষ্টু পাখী (বউ কথা কও), উপকারী পাখী (শকুনি), গৃহস্থ পাখী (শালিক), ডাকাত পাখী (কাক), নোংরা পাখী (কাদা খোঁচা), সুখের পাখী (পায়রা) ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমার বন্ধুটি কোন্ জাতের পাখী ? এখনও ছাড়া আছেন, না কোন পিঞ্জর আলো করেছেন ? বিশেষ কিছুই জানি না তাঁর সম্বন্ধে, তবে একটা জিনিস আন্দাজ করছি, তিনি আমার হিতৈষিণী একজন। লিখেছেন লতিকার দাদা বিজয়বাবুর সহায়তায় তোমার ফিলসফি জ্ঞান বৃদ্ধি করবার ব্যবস্থা করে' আমি নাকি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। কারণ লতিকাগ্রজটি একটু নাকি বাতিকাতুর। প্রেমে পড়ার বাতিক আছে। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে একটা উত্তর দিয়ে দিলাম এবং লিখে দিলাম যে বিজয়বাবু হাসিকে

ফিলসফি পড়াবেন কি না তা হাসি নিজেই ঠিক করবে। এ বিষয়ে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে হাসিকেই বলবেন। এ ছাড়া আর কি লিখতে পারি বল!

অনন্ত ভালবাসার নিদর্শন অসংখ্য চুম্বন পাঠাবার অদম্য ইচ্ছা অকুতোভয়ে ব্যক্ত করছি। এর বেশি আর কিছু করবার উপায়ও তো নেই আপাতত।

১৯

৬-৪-৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি ভাল আছেন। কাল হাসি আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমরা তো অপ্রস্তুতের এক শেষ। একে তো আমরা গরীব মানুষ, আপনার বউকে যথাযোগ্য খাতির করবার অবস্থাই তো আমাদের নয়, তাও যদি আগে থাকতে জানা থাকত যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে রাখতাম। উনি যেদিন আনতে গেলেন সেদিন হাসি এল না। গলায় ব্যথা না কি হয়েছিল। আজ বিকেলে তিনটার সময় হঠাৎ লতিকার সঙ্গে এসে হাজির। সঙ্গে লতিকার দাদা বিজয়। লতিকা যদিও পড়ার জন্য হোস্টেলে থাকে কিন্তু ওদের বাড়ি আমাদের পাড়ায়। বাড়িতে পড়ার অসুবিধা বলে' লতিকার স্বামী তাকে খরচ দিয়ে হোস্টেলে রেখেছে। লতিকার বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল নয়, আমাদেরই মতো। দেখুন বকর বকর ক'রে কি যা-তা বাজে কথা লিখে যাচ্ছি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। হাসি আসাতে আমরা তো অপ্রস্তুত। উনি তখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। আমি ময়লা চিরকুট একটা কাপড় পরে' কলতলায় বসে' বাসন মাজছি। ঠিকে ঝিটা ক'দিন থেকে কামাই করছে। কলে জল আবার বেশিক্ষণ থাকে না' তাড়াতাড়ি কাজ সেরে না নিলে মহা আতান্তরে পড়তে হয়।

কি করি, হাসিকে খালি বারান্দার উপরেই ভাঙা মোড়াটার উপর কম্বলের আসন পেতে দিলাম এবং বাসন মাজতে মাজতেই গল্প করতে লাগলাম তার সঙ্গে। আমরা মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়ার ধার তো কখনও ধারিনি, হাসির সঙ্গে ঘর-কন্নার গল্পই করলাম। লতিকাদের গল্পই করলাম অনেক। লতিকা আর বিজয়বাবু হাসিকে আমাদের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ী চলে গেল। লতিকার দাদা বিজয়বাবু ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল শুনেছি। তার বিয়ে নিয়ে কিছু গোল হয়েছে। বিজয়ের মনোগত ইচ্ছে লেখাপড়া জানা একটি সুন্দরী বউ হোক। কিন্তু লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েদের বাপেরা ওরকম ঘরে মেয়ে দেবে কেন, আপনিই বলুন। বিজয় ছেলে ভালো হতে পারে কিন্তু অবস্থা যে খুব খারাপ। ভাগ্যে লতিকা মেয়েটি দেখতে ভালো, ম্যাট্রিক পাশ, তাই প্রায় বিনা পণে একটি বড়লোকের বিদ্বান ছেলে তাকে বিয়ে করেছে। বিজয়ের অবস্থা খারাপ, তাই ভাল মেয়ে পাচ্ছে না। তা ছাড়া, বিজয়ের বাপের ভিরকুটিও আছে কিছু। তাঁর মনোগত ইচ্ছে বেশ মোটা পণ নেওয়া, তা সে মেয়ে যেমনই হোক। কালো কুচ্ছিৎ একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকটা ঠিক হয়েছে শুনলাম। বিজয় কিন্তু খুব আপত্তি করছে নাকি। আপনার হাসির সঙ্গে এইসব গল্পই করলাম অনেকক্ষণ ধরে। খুব ভালো লাগল হাসিকে। চমৎকার মেয়ে। মুচকি হেসে হেসে অনেক গল্প করলে আমার সঙ্গে। লেখাপড়া জানে বলে লতিকার হাবে ভাবে যেমন একটু অহঙ্কেরে ভাব আছে, হাসির তা মোটে নেই দেখলুম। বাড়ীতে মুড়ি আর শশা ছিল। তাই দিলাম। একটি জামবাটি মুড়ি পার করলাম দুজনে মিলে শশা আর আচারের চাকনা দিয়ে। গলাটা এখনও সারেনি তেমন। খুক্ খুকে কাশি রয়েছে একটু। গরম গরম ঘি আর গোলমরিচ খেতে বলেছি। আমার ইচ্ছে ছিল রাত্তিরটা আমাদের এখানে থেকে চারটি মাছ ভাত খেয়ে যায়। কিন্তু হোস্টেলের ছুটি নিয়ে আসেনি। একটু

পরেই বিজয় এসে নিয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। খুব ভাল লেগেছে হাসিকে আমার। ওঁকে বলব আর একদিন সময় করে' নিয়ে আসতে। আপনি হোস্টেলে ছুটির বন্দোবস্ত করে' দেবেন। আমার প্রণাম নিন। ইতি—

চিত্রা।

২০

৮-৪-৪৯

যে-মেয়েটির নাম কিছুতে বলব না বলেছি তার নাম জানবার এত আগ্রহ কেন! তার নাম না বললে ওষুধ খাবে না? ডাক্তার দেখাবে না? এ তো মহা আব্দার দেখছি তোমার। না গো না, তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়। চিত্রা আমার সম্বন্ধে যত উচ্ছ্বসিতই হোক, তুমি যা আন্দাজ করছ তা ভুল। চিত্রা সত্যিই পতিব্রতা নারী। তুমি যা ভাবছ তা যদি হত তা হলে সে অত উচ্ছ্বসিত হত না, চুপটি করে থাকত। যাক, তোমার সন্দেহ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। শেষকালে কি একটা করে বসবে! যা বোকা তুমি। আচ্ছা, শোন তবে।

কল্পনা মেয়েটির নাম। শুধু আমি নয়, পৃথিবীর সমস্ত কবিরা এর প্রেমে পড়েছে। একে সম্বোধন করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি। কি দুষ্টু দেখ। রবীন্দ্রনাথের মতো লোককেও ভুলিয়ে ভালিয়ে নৌকোয় তুলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। আমারও আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় প্রায়ই। সেদিন রাত্রে শোবার আগে জানালা খুলে দেখতে গেলাম আকাশের কি অবস্থা। দেখলাম, সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। হঠাৎ মনে

গেল খানিকটা মেঘ, পরদা সরে গেল যেন, জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠল দুটো তারা, দুটো চোখ যেন। তার চোখ। মিট মিট করে আমার দিকে চেয়ে বললে, আসবে এখানে? এস না, বেশ মজা হয় তা হলে! চলে গেলাম নিমেষে। মেঘের পিছনে রহস্যময় যে নক্ষত্রলোক আছে সেইখানে ঘুরে বেড়ালাম ছায়া-পথে-পথে, সাঁতার কাটলাম আকাশ-গঙ্গায়, জ্যোতির্ম্ময় হাঁসের পিঠে চড়ে বীণা-মণ্ডলের কাছাকাছি হয়েছি, এমন সময় হঠাৎ দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল জানলার কপাট দুটো! ফিরে এলাম মর্ত্ত্যলোকে, আবার লক্ষ্ণৌ শহরের মেসে। ....

তোমরা আমাকে 'অসিত' বলেই জান, ও কিন্তু আর একটা নাম দিয়েছে আমার। বিন্দুসাগর গুপ্ত। বিন্দুসাগর গুপ্তর লেখা 'জনয়িত্রী' গল্পটা তোমার ভাল লেগেছিল শুনেছিলাম।

এইবার হল তো? উঃ কি হিংসুটে তুমি। আচ্ছা, তুমি কি করে ভাবতে পারলে যে আমি তোমাকে ছেড়ে এখন অন্য মেয়েকে ভালবাসছি!

তোমাকে কোন সম্বোধন করি না বলে তোমার বান্ধবীরা হতাশ হয়েছেন না কি! তোমার বান্ধবীদের হতাশা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে নেই তত। তবে তুমিও যদি হতাশ হয়ে থাক তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে বই কি। সত্যিই তুমি চাও না কি যে আমি তোমাকে সম্বোধন করি কিছু একটা। নিরামিষ 'কল্যাণীয়াসু' নিশ্চয়ই চাও না, যদিও তোমার 'শ্রীচরণেষু'র পালটা জবাবই হচ্ছে ওই। কিন্তু তুমি কিম্বা তোমার বান্ধবীর দল এতে খুব খুশি হবে মনে হয় না। 'আমার প্রাণের হাসি,' 'আমার দুষ্টু হাসি' 'আমার সফল স্বপ্ন' 'ওগো আমার মনের কথা,' 'ওগো আমার সই'—এসব চলবে কি? কিম্বা আরও থিয়েটারি ধরনের যদি চাও, 'প্রাণেশ্বরী' 'প্রিয়তমে', 'প্রাণাধিকে' 'জীবিতেশ্বরী'—তাও লেখা যেতে পারে যদিও বানানগুলো একটু কটমট।

অনেকে দেখেছি শরীরের মোক্ষম মোক্ষম অংশগুলির সঙ্গে প্রেয়সীর উপমা দিয়ে সুখ পান। 'আমার হৃদয় রাণী' 'আমার নয়ন মণি' ইত্যাদি। কিন্তু হৃদয় ও নয়ন ছাড়া শরীরের মোক্ষম (অর্থাৎ vital) স্থান আরও তো অনেক আছে। তাদের আশ্রয় নিলে নূতনত্বও হবে কিছুটা। দেখা যাক কেমন শোনায়। 'ওগো আমার লিভার' 'হে আমার লাংস, 'অয়ি থাইরয়েড'—নাঃ তেমন শ্রুতিমধুর শোনাচ্ছে না তো। ইংরেজি বলে কি? আচ্ছা বাংলা তর্জমা করে দেখা যাক মোলায়েম হয় কি না। ধর যদি বলা যায়, 'ওগো আমার ফুস্‌ফুস্‌ রাণী', কিম্বা 'ওগো আমার যকৃৎ-মণি'—কেমন লাগবে? রাগ করছ না কি। হুঁ, নিশ্চয় করছ। বেশ দেখতে পাচ্ছি হাসির ঠোঁট দুটি ফুলে উঠেছে। তোমার উপযুক্ত কোন সম্বোধন আমার মাথায় এখনও পর্য্যন্ত আসেনি, এইটেই হল আসল কথা। আমার হাসিকে একটা সম্বোধনের কারাগারে বন্দিনী করে ফেলতেও মন সরে না। তার যে অনেক রূপ বিচিত্র বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে মনের উপর। দু'-একটা কথা দিয়ে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আর যারই থাক, আমার নেই। ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। তুমি অসম্বোধিতাই থাক।

তোমার চিঠি আমার কেমন লাগে বার বার এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? বলেছি তো অনেক বার—খুব খু-উ-ব ভাল লাগে। সত্যি বলছি, ভারি মিষ্টি। একেবারে সহজ সুন্দর স্বচ্ছ। তোমার চিঠির ভিতর তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভাষার আয়নায় যেন তোমার ছবিখানি। চিঠিতে বাজে কথা লিখবে না তো কি লিখবে আর? বাজে কথা বলেই তো অত সুন্দর লাগে। বুটের ডালের দর কত, কাপাস তুলোর চাষ কখন করা উচিত, লংক্লথ বেশি মজবুত না টুইল বেশি মজবুত—এই ধরনের কাজের কথা তোমাকে লিখতে হবে না। বাজে কথার রঙীন বুদ্‌বুদই ফুটিয়ে তোল তুমি অনর্গল।

কাজের কথার কচকচিতে

কাজিয়া লড়াই চলছে অনুক্ষণ

তুমি ওতে আর মেতো না

বাজে কথায় বাজুক তোমার মন।

অনেক 'আদর' পাঠিয়েছ দেখছি। কতগুলো? কাছে যখন ছিলে তখন তো একটুও দিতে না। কত খোশামোদ করতে হয়েছে। দুষ্টু।

আমি কিন্তু যা পাঠাতে চাই তা পাঠানো যাবে না, এমন কি 'ইন্‌সিওরড' পার্শেলেও না। কাছে না থাকলে তা দেওয়া যায় না।

রাত দুটো এখন। এবার শোয়া উচিত। কি বল? তুমি পাশ করতে পারবে না এ ভয় হচ্ছে কেন তোমার? নিশ্চয়ই পাশ করবে, নিশ্চয়ই। ঠিক দেখো!

কিছু 'আদর' আমিও পাঠাচ্ছি। আদর মানে কি জানো তো? 'দর পর্য্যন্ত'। তার বেশি নয়!

অসিত

২১

৯-৪-৪৯

এবার তোমার চিঠি পেয়ে চমকে গেছি।

"তোমার চিঠি আমার খুব ভাল লাগে"—আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করনি লিখেছ। লিখেছ- ওটা হয় আমার অতিশয়োক্তি, না হয় ভদ্রতা। কিন্তু এ ছাড়াও আর যে সব কথা লিখেছ তাতে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। তুমি লিখেছ, "আমি হয়তো কোনও দিনই তোমাকে সুখী করতে পারব না কোন দিক দিয়েই। এমন কি,

চিঠি লিখেও যে তোমাকে আনন্দ দিতে পারব সে ভরসা নেই। যদিও তোমার সুরে সুর মিলিয়ে চিঠি লিখতে চেষ্টা করি, চিঠি না পেলে রাগ করি, অভিমানও করি কিন্তু সত্যি বলছি সমস্তটাই মেকি মনে হয়। মনে হয় যেন কর্ত্তব্য করে যাচ্ছি। চিঠি পেলে উত্তর দিতে হয়, তাই উত্তর দিই, ঠিক আন্তরিক প্রেরণা যেন পাই না। শুধু তোমার বেলাতেই নয়, সকলের বেলাতেই এই ব্যাপার। বাবা-মা ভাই-বোন সকলের সঙ্গেই আমি চিরকাল আইনসঙ্গত নিখুঁত আচরণ করে এসেছি। জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সকলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি'টা আছে তাকে কেউ খোঁজেনি কোন দিন। ভেবেছিলাম তুমি খুঁজবে কিন্তু তুমিও খুঁজলে না। তুমিও নিতান্ত মামুলি রঙীন কথার ফুলঝুরি কেটে বাইরের লেফাপাটাকেই মুগ্ধ করতে চাইলে চিরাচরিত প্রথায়। আর আমিও তার উত্তরে নিতান্ত 'মেকি' যে সব ফুলঝুরি কাটছি তাও নাকি তোমার খুব ভাল লাগছে। বিশ্বাস করলাম না একথা। 'মেকি' জিনিসকে 'মেকি' বলে সত্যি যদি না ধরতে পেরে থাক তা হলে বুঝব তোমার ভালবাসাটাও ভান মাত্র।"

তোমার এই নিদারুণ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝতে পারছি না একটুও। ঠাট্টা করছ, না ভয় দেখাচ্ছ, না সত্যিসত্যিই আত্ম-আবিষ্কার করেছ বুঝতে পারছি না ঠিক। তোমার লেফাপার ভিতর যে "তুমি" বাস করছে তার সন্ধান তোমার বাবা-মা পর্য্যন্ত যখন পাননি তখন আমার পেতে একটু দেরি হবে বৈ কি। সবে মাত্র তো আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে। তা ছাড়া, তোমার লেফাপাটাই বা কি কম সুন্দর? সেইটের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে যদি কিছুদিন কেটে যায় তাতেই বা ক্ষতি কি। কিন্তু তোমার হঠাৎ কি হল বল দিকি! এমন একটা খাপছাড়া সুর ধরলে কেন?

আচ্ছা তুমি কি করে ভাবলে বল দেখি যে, এমন একদিন

আসতে পারে যেদিন আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব, তোমাকে আর মনে পড়বে না। এসব কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার? কি হয়েছে খুলে লিখো সব, লিখো লক্ষ্মীটি। সামনে পরীক্ষা, এসব কি যা-তা কথা ভাবছ এখন?

কাল সমস্ত দিন কবিতা লিখেছি বসে বসে। বলা বাহুল্য কবিতার বিষয় 'হাসি'। এই সঙ্গেই পাঠাতাম কবিতাগুলো, কিন্তু তুমি রঙীন কথার ফুলঝুরি পছন্দ কর না লিখেছ, তাই সে বাসনা পরিত্যাগ করলাম। একজন বন্ধু বলেছে কবিতাগুলো ভালো হয়েছে, মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে। পাঠিয়ে দিলেই যে ছাপা হবে তার কোন স্থিরতা নেই; যদিই বা হয়, তা হলেও আর একটা পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। ধর, যদি দেখি যে আমার কবিতা ছাপান হবার এক বৎসর পরে সেই পুরানো মাসিক পত্রগুলো কোন মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর সেই মুদি আমার কবিতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মশলা বিক্রি করছে, তা হলে? তার চেয়ে কবিতাগুলো আমার বাক্সেই বন্ধ থাক আপাতত। এমন দিনও তো আসতে পারে যখন রঙীন কথার ফুলঝুরিই তোমার ভাল লাগবে। তখন তোমাকে দেওয়া যাবে সেগুলো।

·· অনেক রাত হয়ে গেছে। শুই এবার। লেফাপার কাছেই আদর পাঠাচ্ছি অনেক। ভাল কথা, লেফাপার অন্তরালে যে 'আমি'টি আছেন কি প্রমাণ পেলে বুঝবে যে আমি তাঁরও নাগাল পেয়েছি একটু আধটু? সত্যিই কি কোনও প্রমাণই পাওনি? আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু! প্রমাণ দেবার জন্যে বিশেষ কোনও চেষ্টা যদিও করিনি আমি কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেক প্রমাণ তোমাকে দিয়েছি। দিইনি?

সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার। কেন এসব লিখেছ, কেন তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে সব মেকি, সব মিথ্যে! আমি খুবই

চিন্তিত শুধু নয়, অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছি। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। তোমার চিঠি না আসা পর্য্যন্ত পড়াশুনা কিছু হবে না। কেন এমন একটা ভুল ধারণার কুয়াসা তোমার মনকে আচ্ছন্ন করেছে তা জানাতে দ্বিধা কোরো না একটুও, যত রূঢ় তা হোক না কেন, আমি শুনতে প্রস্তুত আছি। ইতি—

তোমারই

অসিত

২২

১৪-৪-৪৯

ভাই অসিতবরণ,

গতকল্য আমি চিত্রাকে সঙ্গে লইয়া তোমার স্ত্রীর হোস্টেলে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি তোমার স্ত্রী তখনও হোস্টেলে ফেরেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম—প্রায় ঘণ্টাখানেক—তখনও তিনি ফিরিলেন না। তখন হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে আবার খবর পাঠাইলাম। তিনি বলিলেন যে, হাসি তাঁহার নিকট হইতে ছুটি লইয়া তাহার বাবার সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। হয়তো ফিরিতে দেরি হইবে। তাহার বাবার ঠিকানাটা জানিয়া লইলাম। শুনিলাম তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানাটা জানিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য—হাসিকে গিয়া সেখানেই ধরিব এবং একটা দিন ঠিক করিয়া পুনরায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইব। এই ফাঁকে তোমার শ্বশুরের সহিতও আলাপটা হইয়া যাইবে। তাঁহাকে তো দেখি নাই কোনও দিন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানায় গিয়া তোমার শ্বশুরের দেখা পাইলাম কিন্তু হাসিকে ধরিতে পারিলাম

না। তোমার শ্বশুর বলিলেন তোমার হুকুম অনুসারেই সে নাকি তোমার কোন বন্ধুর সহিত ডাক্তারের নিকট গলা দেখাইতে গিয়াছে। গলা দেখাইয়া হোস্টেলে ফিরিয়া যাইবে। ঠিক করিয়াছি আগামী শনিবার দিন আবার যাইব। তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া চিত্রার মনে খুবই ক্ষোভ হইয়াছে। রবিবার দ্বিপ্রহরে হাসিকে খাওয়াইব মনঃস্থ করিয়াছি। তুমি যদি ইতিমধ্যে চিঠি লেখ কথাটা তাহাকে জানাইয়া দিও। সুপারিনটেণ্ডেন্টকেও লিখিও। তোমার শ্বশুর মহাশয় ভারী চমৎকার লোক দেখিলাম। কথা কহিতে কহিতে আর একটা কাজের কথা বাহির হইয়া পড়িল। আমাদের অফিসের বড়বাবু সদানন্দ চক্রবর্ত্তী না কি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। আমার সুবিধাই হইয়া গেল। তোমার শ্বশুর নিজে হইতেই বলিলেন যে বড়বাবুকে আমার কথা বলিয়া দিবেন। বড়বাবু আমার উপর যদি একটু নেক্ নজর করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমার প্রমোশন হইয়া যাইবে। মাহিনাটা কিছু বাড়িলে সর্ব্বাগ্রে একটা ভদ্রগোছের বাসা ভাড়া লইব। এই বাসাটাতে চিত্রা বেচারীর সত্যিই বড় কষ্ট হয়। বড়লোকের মেয়ে তো। কপালগুণে না হয় আমার হাতে পড়িয়াছে কিন্তু আমার তো দেখা উচিত তাহাকে যতটা সুখে রাখিতে পারি। তুমি আবার কথাটা যেন চিত্রার কানে তুলিয়া দিও না—
—যা মুখ-আলগা লোক তুমি। চিত্রাকে সুখে রাখিবার জন্য যে আমি প্রাণপণ করিতেছি এ খবর শুনিলে সে আবার অত্যন্ত চটিয়া যাইবে। এমন কাজটি করিও না। আশা করি তোমার পড়াশোনা বেশ ভাল মতো হইতেছে। এইবার ফাইনাল তো? আর ভাবনা কি। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। চিঠির উত্তর যেন পাই। ইতি—

মহেন্দ্র

১৫-৪-৪৯

আজও তোমার কোন চিঠি এল না। মনে হচ্ছে যেন আট-দশ বছর তোমার কোনও খবর পাই নি। তুমি যেন অত্যন্ত দূরে চলে গেছ। বিশেষত, তোমার শেষের চিঠির সুরটা যেন একটা অসুরের মত সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। কি হয়েছে যদি জানাতে তা হলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতাম। সামনে পরীক্ষা না থাকলে সোজা চলে যেতাম ঠিক। কিন্তু তুমি চিঠি লিখছ না কেন? হয়েছে কি! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সবটাই তোমার দুষ্টুমি, আমাকে নাকাল করে মজা দেখছ দূর থেকে। আবার মনে হচ্ছে তোমার চিঠির সুরে যে আন্তরিকতা বেজে উঠেছে তা যদি অভিনয়ই হয় তা হলে তোমাকে প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্টের সম্মান দেওয়া উচিত। সম্মান দিতে আপত্তি নেই (বরং আমি খুশিই হব খুব) কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানা চাই। দোহাই তোমার, এমনভাবে চুপ করে থেক না। মহেন্দ্রের চিঠি পেয়েছি একখানা। তার চিঠিতে খবর পেলাম তুমি ডাক্তার বোসের কাছে গিয়েছিলে গলা দেখাতে। অতুলের সঙ্গে গিয়েছিলে? মহেন্দ্র লিখেছে তোমার বাবাও কোলকাতাতে এসেছেন নাকি! তিনিই মহেন্দ্রকে বলেছেন যে তুমি নাকি আমার হুকুমে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেছ। মহেন্দ্রের চিঠি পড়ে মনে হল যে তোমার গলার ঘায়ের সম্বন্ধে তোমার বাবার যেন কোনও দুশ্চিন্তা নেই, আমার হুকুমে বাধ্য হয়ে তুমি যেন একটা বাজে কাজ করতে গেছ! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না দূর থেকে। তোমার বাবা এখন এলেনই বা কেন হঠাৎ? তোমার মাও এসেছেন কি? সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। তোমার চিঠি না পেয়ে খুবই চিন্তিত আছি আমি।

কল্পনা, মানে সেই মেয়েটি, আমার কানে কানে বলছে, "তুমি রূপকথা-লোকের মানুষ, যদি অসম্ভব কিছু ঘটেই যায় তা হলে চমকে উঠবে কেন? এইটেই তো রূপকথা-লোকের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার ফুল হঠাৎ যদি পরীতে রূপান্তরিত হয়ে পাখা মেলে আকাশে উড়ে যায় তাতে বিস্মিত হবার কি আছে, সেখানকার রাণী তো হরদম রাক্ষসী হয়ে যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তোমার হাসি যদি এক ফোঁটা অশ্রুই হয়ে যায় শেষ পর্য্যন্ত তাতেই বা কি! ভাবছ কি অত? দেখ না মজাটা"।

মজাটা উপভোগ করবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। তার কারণ বোধ হয়, যে-দূরত্ব থাকলে মজা উপভোগ করা যায়, তোমার সম্পর্কে সে দূরত্বটা হারিয়েছি। বস্তুত, মনের দিক থেকে আমার সঙ্গে তোমার কোনও দূরত্ব যেন নেই। আমার নিজের কোনও আকস্মিক আমূল পরিবর্ত্তন কল্পনা করতে আমি যেমন ভয় পাই, তোমার সম্বন্ধেও তেমনি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যে ভিত্তিহীন তা অবিলম্বে প্রমাণ কর। খুব খারাপ লাগছে। ডাক্তার বোস কি বললেন তাও লিখো। অনেক অনেক আদর জানাচ্ছি এবং প্রত্যাশাও করছি। ইতি—

তোমারই
অসিত

২৪

২-৫-৪৯

ভাই অসিত,

বন্ধু-কৃত্যটা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছি, কিন্তু তা করে' খুব যে একটা আনন্দ পেয়েছি তা বলতে পারি না। তোমার স্ত্রীকে ডাক্তার

বস্তুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু শি হ্যাজ মেড মি ফীল যেন আমি কোনও অন্যায় কাজ করেছি। যতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল একটিও কথা বলেনি, নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড, একেবারে যাকে বলে "মাম্"। কিন্তু নীরব ছিল বলেই যে তার মনোভাব অপ্রকাশিত ছিল তা মোটেই নয়। তার মৃদু হাসি, আনত দৃষ্টি, ভব্য মুখভাবের অন্তরালে মেঘান্তরালবর্তী বিদ্যুতের মতো এমন একটা বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত, যা ভাষায় প্রকাশ করলেই অভদ্র হয়ে যাবে। "তোমরা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন, প্লীজ লেট মি অ্যালোন, আমাকে বিরক্ত করো না, দয়া করে তোমরা কেবল তফাতে সরে থাক, ইউ মেডলিং সোয়াইন"—এই হল তার বাচনিক রূপ, ভাষায় এর চেয়ে ভদ্ররূপ তাকে আর দেওয়া যায় না। কিন্তু এটাই তার সম্পূর্ণ রূপ নয় তাও বলে দিচ্ছি। তোমাকে একটা কথা জিগেস করছি। হ্যাভ ইউ আণ্ডারস্টুড হার? আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার স্ত্রীকে বুঝতেই পারনি এখনও। এত অল্প দিনের মধ্যে বুঝতে পারার কথাও নয়। ক'দিনই বা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছ ওর সঙ্গে। বেশিদিন মিশলেও যে পারবে, সে ভরসাও আমি করি না। আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু শুধু বলতে পারি, ওর নাম হাসি না হয়ে অসি হলে বেশি মানাত। অধিকাংশ সময়ই খাপের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে হয়তো কিন্তু আত্মপ্রকাশ যখন করবে তখন সাবধান! ওর খাপছাড়া মূর্তির একটু আভাস সেদিন পেয়েছিলাম! আমি যখন হোস্টেলে ওকে আনতে গেলাম শুনলাম ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এটা প্রত্যাশা করিনি। ওর বাবা যে কোলকাতায় আছেন তাই জানা ছিল না আমার। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে ঠিকানাটা ছিল, হাসিই ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল যে আমি এলে এই ঠিকানায় যেন যাই। আমি যে আসব তা ও জানত, কারণ আমি সকালেই সে কথা ফোনে জানিয়েছিলাম। ওর বাবা যে কোলকাতায়

আছেন, তাঁর কাছে ওর যে বিকেলে যাওয়ার কথা আছে এ সব কথা কিন্তু কিছু বলেনি আমাকে ফোনে। সেই জন্যে মনে হচ্ছে তোমার শ্বশুর মশায় হঠাৎই এসেছেন কোলকাতায়। যাই হোক, আমি যখন গেলাম তখন গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলাম বাইরের ঘরে হাসি কার সঙ্গে যেন কথা কইছে। বারান্দায় উঠলাম, পায়ে কেডস থাকাতে শব্দ হল না কোনও। উঠেই শুনতে পেলাম হাসি বলছে "তুমি, আমাকে আগে বলনি কেন? সারাজীবন আমার সঙ্গে এতবড় একটা ভণ্ডামি করেছ একথা ভাবতেই পারছি না আমি!" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষণিকের জন্য আমি খাপ-খোলা তলোয়ারটাকে দেখতে পেলাম। পরমুহূর্তেই আবার খাপে ঢুকে পড়ল সে। আমার দিকে চেয়ে ভদ্রভাবে নমস্কার করে বললে, "ও, আপনি এসেছেন, চলুন যাই।"

নীলাম্বর বাবু, মানে. তোমার শ্বশুরও বেরিয়ে এসেছিলেন। "কোথা যাচ্ছ" জিগ্যেস করলেন তিনি।

"ডাক্তারের কাছে"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে হাসি নেবে পড়ল রাস্তায়, একটিও কথা হয়নি তার সঙ্গে। আমি কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম দু'-একবার। কিন্তু উত্তর না পেয়ে আমাকেও শেষটা চুপ করে যেতে হল। সে আমার প্রত্যেক কথার উত্তরে মুচকি হেসেছিল বটে কিন্তু তার চোখের চাহনিতে প্রতি মুচকি হাসির সঙ্গে যে জিনিসটা চক্‌চক্ করে' উঠছিল—মাই গড—তা রীতিমত 'রিপেলিং', তার অর্থ, "কেন বাজে বক বক করছেন!"

ডাক্তার বন্ধু তোমার স্ত্রীর গলা দেখে বললেন, রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। রক্ত নিজেই নিয়ে নিয়েছেন তিনি ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দেবেন বলে'। রক্ত পরীক্ষার ষোল টাকা ফী আমি দিয়ে দিয়েছি তাঁকে। রক্তের রিপোর্ট তিনি হাসির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। এ সব সম্বন্ধে হাসির সঙ্গেই তাঁর 'কন্‌ফিডেনশ্যাল' কথা-

বার্তা হয়েছে, হাসি তোমাকে জানিয়েছে নিশ্চয়। ডাক্তার বসু যদিও আমার বন্ধুলোক, তবু আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন না। কেবল বললেন, কেবল গলায় নয়, জিবে এবং তালুতেও (টাগরায়) ঘা হয়েছে না কি। হাসিকে তিনি একটা রিপোর্ট লিখে দিয়েছেন তা এতদিনে পেয়েছ তুমি নিশ্চয়।

তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে কথাটা আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, শি ইজ এ মডার্ন গার্ল। সত্যিকার আধুনিকা হবার উপাদান ওর মধ্যে আছে। সত্যি বলছি, প্রচলিত বিধিনিষেধ প্রাচীরপরিখা লঙ্ঘন করে' যাবার শক্তি তোমার তন্বী বউটির আছে বলে মনে হল এবং আমার এই ধারণা তোমাকে না জানালে "এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড" তোমার কাছে অপরাধী হতে হবে বলেই তোমাকে এত কথা লিখলাম।

তুমি যদি জেরা কর, কেন আমার এসব কথা মনে হল, জবাব দিতে পারব না। আই কান্‌ট্। এইটুকু শুধু বলতে পারি, শি হ্যাজ ইনটারেষ্টেড মি। না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—তার বেশি নয় কিছু। আজকাল পথেঘাটে ট্রামেবাসে অজস্র মেয়ে দেখতে পাই, কিন্তু হাসির চোখে সেদিন যে দীপ্তি দেখেছি তেমনটি আর কোথাও দেখেছি বলে' মনে পড়ছে না। সুতরাং এখন থেকে হাসির হোস্টেলের আনাচেকানাচে যদি ঘোরাফেরা করি, রাগ করো না যেন। যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারি জানাব তোমাকেও। ইউ মে রিলাই অন্ মি।

চাকরি এখনও জোটেনি। ভ্যারেণ্ডাই ভেজে চলেছি। হেল্!

ভালবাসা নাও। ইতি—অতুল।

৪-৫-৪৯

দশ দিন কেটে গেল। আজও তোমার চিঠি পেলাম না। কি হল তোমার? চিঠির উত্তর দিচ্ছ না কেন। তোমার শরীর কেমন আছে জানবার জন্যে তোমাদের মাসীমাকে চিঠি লিখেছিলাম একখানা। তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তোমার শরীর ভালই আছে। এমনভাবে চুপ করে' থাকবার মানে কি তাহলে?

এখন অনেক রাত। কিছুক্ষণ আগে একটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম এল না, তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। যদিও তুমি আমার চিঠির উত্তর দাওনি, তবু লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছে অভিমান করেছ তুমি, তোমার স্ফুরিত অধরের কম্পনটা দেখতে পাচ্ছি যেন। কি হয়েছে, বলবে না? অনেক দিন আগে তুমি আমাকে পাঞ্জাবির একটা মাপ পাঠাতে লিখেছিলে। পাঠানো হয় নি। তাই রাগ হয়েছে? আচ্ছা, এবার তোমার চিঠি পেলে ঠিক পাঠাব। দরজির কাছে গিয়ে পাঞ্জাবির মাপটাপ দেওয়া হাঙ্গামের ব্যাপারে, তাই হয়ে ওঠেনি। এবার ঠিক পাঠাব। এবার তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র পাঠাব।

মনের ভিতর কত কথা যে জমে আছে। কিন্তু তা প্রকাশ করা যাবে না। ঠিক যেন মেঘের মতো। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। কখনও স্তূপীকৃত, কখনও বিসর্পিত। সন্ধ্যার সোনা, উষার আবীর, জ্যোৎস্নার জরি, বর্ষার অশ্রু, বিদ্যুতের চমক—সব কিছুরই স্পর্শ লাগছে তাতে। দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, কিন্তু প্রকাশ করা যাবে না ভাষায়। সত্যি কি তুমি বুঝতে পার না একটুও? আজ আবার চাঁদ উঠেছে, জানলা দিয়া দেখতে পাচ্ছি। "আবার গগনে

কেন সুধাংশু উদয় রে”—হেমচন্দ্রের কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে। সেই সেদিনের কথাটাও মনে পড়ছে। সেই যে ছাতে! চাঁদের আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। “দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে” সত্যিই যেন সেদিন এসেছিল তোমার মনে। .... একদল মেঘ এসে চাঁদটাকে অস্থির করে তুলেছে। বিশেষত দু'-একটা কালো মেঘ একেবারে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেতে চায় না! হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমি যেন ওই কালো মেঘ, জোর করে' অধিকার করতে চাইছি নির্ব্বিকার তোমাকে!

....তোমার পুরোনো চিঠিগুলো ওলটালাম। একটা চিঠিতে দেখছি তোমার বান্ধবীরা নাকি আমার তুলনায় তোমাকে তুচ্ছ মনে করেছেন। কেন, আমার কবিতা পড়ে'? তাঁদের একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। এক রাজকন্যার এক ফুলের বাগান ছিল। একদিন তিনি সখী-সমভিব্যাহারে বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন তাঁর চাঁপাগাছের ডালে কে যেন একটি সোনার জাল টাঙিয়ে রেখে গেছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, জালটা সোনার নয়, পশমের মতো সুতো দিয়ে বোনা, সূর্য্যের আলো পড়ে' সোনালি দেখাচ্ছে। কারুকার্য্য দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সখীকে বললেন, কে ভাই এমন নিপুণ শিল্পী! সখী উত্তর দিলেন, কে তা জানি না, কিন্তু তিনি যে-ই হোন তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি উঁচুদরের লোক, তাঁর কাছে তুমি আমি তুচ্ছ। পরে খোঁজ করে' জানা গেল শিল্পীটি মাকড়শা। তোমার বন্ধুদের রসবোধের প্রশংসা করতে পারলাম না। সত্যি, এত খারাপ লাগছে তোমার চিঠি না পেয়ে। কি হয়েছে তোমার? নিশ্চয়ই কিছু হয়নি। আমাকে ভাবাবার জন্যে দুষ্টুমি করে চিঠি লিখছ না। পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত আছ না কি? প্রিপারেশন কিছু হয়নি মনে হচ্ছে নিশ্চয়। আমারও হচ্ছে। কিন্তু ওটা, মানে ওই রকম মনে হওয়াটা, একটা ভাল লক্ষণ শুনেছি।

নিউটন কি বলেছিলেন জানো তো? সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি। সক্রেটিসও বলেছিলেন না কি যে, আমি জানি যে আমি অজ্ঞ, তাই আমাকে সবাই বিজ্ঞ বলে। সুতরাং কিছু জানি না মনে হওয়াটা আশাপ্রদ ব্যাপার।

.... তোমার চিঠি না পেয়ে একটুও ভাল লাগছে না সত্যি। লিখতেও ভাল লাগছে না, অথচ থামতেও পারছি না, নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। বিরাট একটা দেশ যেন। এত বিরাট যে তার আদি অন্ত পাওয়া মুস্কিল। তার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা আরও শক্ত। এই তাব আকাশে রোদ হাসছিল হঠাৎ সূর্য অস্ত গেল অন্ধকার ঘিরে এল। আকাশে তারার ছড়াছড়ি। দেখতে দেখতে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশে মেঘ ছেয়ে আসে আবার। তারা ঢেকে যায়। ঘনিয়ে আসে নিস্তব্ধতা। ভীষণ বজ্রপাতে সচকিত হয়ে ওঠে আবার চতুর্দিক। তাও আবার থাকে না। উষার অরুণিমা দেখা দেয় একটু পরেই। রামধনু ফুটে ওঠে কালো মেঘে। এই বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে বসে' তোমার কথা ভাবছি। কত বাসনা ফুলের মতো ফুটে ফুলের মতোই ঝরে যাচ্ছে। একটা খামখেয়ালী হাওয়া ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব। মনে হচ্ছে তুমিই যেন সেই হাওয়া। আমার কাছে কি চাইছ এসে বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছেই বসে আছ। তোমার একটা হাত যেন আমার পিঠে ঠেকে আছে, তোমাব চুড়ির ঠাণ্ডা যেন আমার গায়ে লাগছে। তোমার নিশ্বাসের বাতাসও যেন অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার চোখ দুটি ছল ছল করছে। কি হয়েছে তোমার, সত্যি বলবে না?

দিনের সমস্ত কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে গেছে, সমস্ত দেহ পরিশ্রান্ত, মন কিন্তু উন্মুখ বিনিদ্র। সে বলছে অমৃত চাই। যখন তুমি ছিলে না তখন এই অমৃতের সন্ধানে বহু স্থানে ঘুরেছি। কবি,

গ্রন্থকার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, খোলা মাঠ, উদার আকাশ, সিনেমা, থিয়েটার। এখন মনে হচ্ছে তুমিই এসেছ সুধাভাণ্ড নিয়ে। হয়তো আর এক হাতে বিষভাণ্ডও আছে। সেই বিষের জ্বালাতেই হয়তো জ্বলছি এখন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে সুধাভাণ্ডও তোমারি অন্য হাতে আছে। বঞ্চিত করবে না তুমি আমাকে তার থেকে।

অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে একটা। মানুষ না হয়ে তুমি যদি গান হতে বেশ হ'ত তাহলে। একেবারে কণ্ঠস্থ করে' রেখে দিতাম। আর আজীবন সাধনা করে' তাতে নানারকম ভাল সুর দিতাম। গাইতাম কখনও বেহাগে, কখনও ভৈরবীতে, কখনও মূলতানে। একই গানে কখনও বর্ষার কাজরী, কখনও শরতের আগমনী বেজে উঠত। মেঘমল্লারে নিবিড় হয়ে আবার খেয়ালে ভেসে যেতে। ছাড়াছাড়ির দুঃখটা পেতে হত না তাহলে। সব সময় গলায় থাকতে গানের তানে তানে। যদিও তোমাব মধ্যে সব সুরের মাধুর্য্যই আছে, কিন্তু হায়, তবু তুমি কেবলমাত্র গান নও, গান ছাড়াও তুমি আরও কিছু, তুমি মানুষ। সীমার মধ্যে অসীমা, ধরার মধ্যে অধরা। তাই তোমাকে সীমার মধ্যে পাওয়া যাবে না, হাতেব মুঠোয় ধরা যাবে না। তবু তোমাকে পেতে চাই, কেন যে চাই জানি না। মনে হয় এই যে বিরহ —এই যে না পাওয়া—এই তো মরণ....

ভালো লাগছে না এসব লিখতে। অথচ এইসব কথাই মনে হচ্ছে খালি।....

....মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই যে সর্বদা স্বপ্নে জাগরণে তার কথা ভাবছ, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর চিঠি লিখতে বসেছ এ আগ্রহ কি এমনিই থাকবে তোমার চিরকাল?"

মন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—"থাকবে"।

"কি করে'! ছেলেবেলা থেকে তোমার তো অনেক জিনিসে এমনি উৎসাহ দেখা গেছে। প্রজাপতির পিছনে ঘোরা থেকে সুরু

করে' সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা পর্যন্ত কোনটাতেই তোমার আগ্রহের অভাব তো ছিল না। আজও কি সে আগ্রহ অটুট আছে? আজ তারা সব কই, তোমার সেই প্রজাপতি পাখী-কুকুর পোষার নেশা, বাগানে ফুলফোটানর সখ, তোমার সেই প্রিয় কবির দল, কই সে সব আজ। এদের কথা তো তোমার মনে আর তেমন আকুলতা আনে না, আগে যেমন আনত। এদের চিন্তায় বিভোর হয়ে রাতের পর রাত জাগতে, এখন তো আর জাগ না। এতদিনকার পরিচিত এদের সম্বন্ধে যখন তোমার এমন অনাগ্রহ জেগেছে তখন এই অপরিচিতাটিকে যে চিরদিন সমান আগ্রহে ধরে রাখতে পারবে তার নিশ্চয়তা কি। তোমার কত বন্ধুবান্ধব তোমায় প্রাণভরে' ভালবাসত, এখনও হয়তো বাসে, তুমিও একদিন তাদের কম ভালবাসনি, কিন্তু তবু তারা আজ স্মৃতিমাত্র। তোমার হাসিরও যে সেই দশা হবে না তার প্রমাণ কি?"

মন আবার খানিকক্ষণ চুপ করে' রইল তারপর কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আবার ইতস্ততঃ করে বলল—"প্রমাণ দিতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি এর প্রতি আমার আগ্রহের শেষ হবে না, কারণ ও আমার একার, আর কারও নয়। আর যা কিছুকে ভালবেসেছি এতদিন তা সকলের ছিল। ওরা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে অপরকে ঠিক তেমনই আনন্দ দিয়েছে। আমার প্রতি ওদের এতটুকু পক্ষপাত নেই। প্রজাপতি, পাখী, কুকুর, বাগান, ছবি, কাব্য, বন্ধু-বান্ধব এরা আজও আমার প্রিয় কিন্তু ওরা আমার অন্তরতম হতে পারে নি, কারণ ওরা সকলের। হাসিকে যদিও এখনও ভাল করে' চিনি না, তবু মনে হয় ও আমার নিজস্ব। ভালো মন্দ যা-ই হোক ও আমার একার। বিশ্বের হাটে ওর দাম যাচাই করারও প্রয়োজন নেই। ও আমার একার এই বোধটুকুই যথেষ্ট। এই মমত্বই অমরত্ব দেবে আমার আগ্রহকে। হাসি আমার, আমার, আমারই, আর কারও নয় এই আনন্দে আই পরিপূর্ণ হয়ে আছি আমি। তাছাড়া

ও মানুষ, ওর রহস্য শেষ হবার নয় সহজে। তাই মনে হয় ওর সম্বন্ধে কৌতূহল শেষ হবে না কখনও।"

"হঠাৎ যদি কোনও দিন আবিষ্কার কর যে ও তোমার একার নয়, তাহলে— ?"

"তা অসম্ভব"

"কি করে' বুঝলে"

"বিশ্বাস করি"

"কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে—"

মন হেসে বললে—"বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দরকার।"

গভীর রাত্রে একা নির্জ্জন ঘরে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি তুমি কাছে নেই বলে। তুমি থাকলে তোমার সঙ্গেই বোঝাপড়া করতাম। এতকাল শোয়ার সময় ঘুম ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না। এখন এ কি হয়েছি! আচ্ছা, সত্যি করে' বল তো চিঠি লিখছ না কেন, কি হয়েছে তোমার! হঠাৎ মনে হল শেষ চিঠিতে তুমি যা লিখেছিলে তার সুরটা ইবসেনী। Doll's House পড়েছ না কি ইদানিং?

"জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সবলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি'টা আছে তাকে কেউ খোঁজে নি কোনদিন।...."

চিন্তাটা খুব আধুনিক নয়, নিতান্ত সেকেলে। উপনিষদেও এই ধরনের কথা আছে। অতুল লিখেছে সে তোমার মধ্যে আধুনিকতার উপাদান দেখেছে না কি। সে কি দেখেছে তা জানি না, আমি কিন্তু দেখেছি। আধুনিকতা কতকগুলো চমকপ্রদ বুলির কপচানিমাত্র নয়। দুর্জ্জয়কে জয় করবার প্রয়াস এবং সাহসই আধুনিকতা। তোমার মধ্যে এ সাহস দেখেছি আমি। প্রমাণও পেয়েছি খানিকটা। আমাকে জয় করেছ তো! অনেকদিন আগে একটি আধুনিকার চিত্র এঁকেছিলাম আমি। পাঠাচ্ছি কবিতাটা এই সঙ্গে।

.... কবিতাটা পড়ে কেমন লাগল জানিও। যদিও মেয়েটির আচরণ আমি সমর্থন করি না, ওর মতের সঙ্গে আমার মতের মিলও নেই, কিন্তু তবু ও যে আধুনিকা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেক রাত হয়েছে। রাত শেষই হয়ে গেল বোধ হয়। শুই একটু। চিঠি লিখো লক্ষ্মীটি। ইতি— অসিত

মেয়েটি সত্যই আধুনিকা।
ভাব-ভঙ্গিতে চাল-চলনেই নয় কেবল,
মনে প্রাণেও।
পোশাক-পবিচ্ছদে পছন্দ করে না
বিদেশী নকলেব সস্তা চাকচিক্য,
অপরের মনে ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে
গয়না-কাপড় ঝকমকিয়ে বেড়ায় না কখনও,
যখন-তখন যেখ'নে-সেখানে
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহিব ক'রে
আসর জমাবার প্রবৃত্তিও নেই।
চাল দিয়ে কথা বলে না,
এমন কি
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে যে সে,
তা বোঝবার উপায় নেই,
ইংরেজী বুকনি মুখ দিয়ে বেবোয় না কখনও।
যেসব জিনিস থাকলে
অহঙ্কারে মটমট করা স্বাভাবিক,
সেসব জিনিস থাকা সত্ত্বেও
তার অহঙ্কার নেই।
বরং তার সঙ্কোচ হয়,

মনে হয় এগুলো বাধা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, ঐশ্বর্য্য,
চারটে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন
আড়াল ক'রে রেখেছে তাকে,
বঞ্চিত করেছে আর পাঁচজনের সঙ্গ থেকে।
সত্যিই লজ্জা করে তার।
এই লজ্জা জিনিসটা তার মজ্জাগত
বাইরে প্রকাশ নেই।
আপাতদৃষ্টিতে তাকে নির্লজ্জ ব'লেই মনে হয়।
জিব কেটে
ঘাড় হেঁট ক'রে
মুচকি হেসে
লাল হ'য়ে
ঘোমটা টেনে
লজ্জা বস্তুটাকে নয়নলোভন দৃশ্য ক'রে তুলতে
আরও বেশি লজ্জা করে তার।
সুতরাং তার জীবন
নীরব এবং নিঃসঙ্গ।
বেশি কথা বলতে পারে না,
মিশতে পারে না কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে।
তার সঙ্গে মেশবার সুযোগই দেয় না সে কাউকে।
দিলেও যে খুব বেশি লোক জুটত
মনে হয় না তা।
কারণ যে জিনিসটি থাকলে
পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে মেশবার উৎসাহ পায়,
সে জিনিসটির অভাব আছে তার।

রূপসী নয়।
স্বাস্থ্যবতী অবশ্য।
কেরিজ, পায়োরিয়া, চশমা কিচ্ছু নেই,
নিখুঁত টিউব,
নীরোগ অ্যাপেন্‌ডিক্স,
মজবুত কবজি,
পুষ্ট পেশী,
ফিট হয় না।
টেনিস খেলা
বাইক চড়া
ড্রাইভ করা
সমস্তই পারে অনায়াসে।
কিন্তু রূপ নেই,—
দুধে-আলতা রং
পটল-চেরা চোখ
তিল-ফুল নাসা
মেঘবরণ চুল
শুধু যে নেই তা নয়,
নেই ব'লে দুঃখও নেই।
যৌবন আছে।
কিন্তু সে যৌবনকে
শাড়ি-কাঁচুলির কৌশলে উদগ্র ক'রে
লোক-লোচনবর্ত্তী করবার প্রবৃত্তি
মোটেই নেই তার।
সুতরাং সে যৌবনও অপ্রকাশিত।
মাথার চুল 'বব' ক'রে ছাঁটা,

ঢিলে পাজামা পরার শখ আছে,
বাইক চড়ার সময় ব্রিচেস পরে,
হঠাৎ দেখলে পুরুষ ব'লেই ভ্রম হয়।
প্রণয়ী জোটে নি সুতরাং—
সাহস নয়, প্রেরণাও পায় নি অনেকে।

প্রণয়ী না জুটলেও
বিবাহার্থী জুটেছিল একাধিক!
কালো, সাদা,
বেঁটে, লম্বা,
সুরূপ, কুরূপ,
ফোঁপরা, শাঁসালো,
বিদ্বান, মূর্খ,
বোকা, বুদ্ধিমান,
নানা রকম।
ভাল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন দেখলে
প্রার্থী আসে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে,
ঠিক তেমনি।
একমাত্র কন্যা সে
বিপত্নীক ধনী পিতার।
বিশাল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।
কিন্তু গোল বাধল।
এতগুলি ভদ্রসন্তানের
অরূপ-সাধনার অন্তরালে
যে সহজিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল,

তা সহজেই প্রকট হয়ে পড়ল।
পিতা দেখলেন,
তাঁর কন্যাটিকে সকলেই চাইছেন
সহধর্ম্মিণী হিসাবে ততটা নয়,
তাঁর লোহার সিন্দুকের চাবি-হিসাবে যতটা।
পুত্রী দেখলেন,
স্বামী হিসাবে লোভনীয় নয় একজনও।
মোটা, রোগা, বোকা, চালিয়াত,
ন্যাকা, হাঁদা, ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ,
উদ্ধত, মিনমিনে,
নানা জাতীয় আবর্জ্জনা
টাকা-ঘূর্ণির টানে
নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে তার চতুর্দ্দিকে।
ভাল ছেলে জুটল না।
দেশে যে একেবারে ভাল ছেলে নেই তা নয়,
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়

বিবাহ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভাল ছেলেরা
কিংবা তাদের অভিভাবকেরা
বেশী মর্য্যাদা দেন
সেই দুটো জিনিসকেই,
যা স্বকীয় সাধনায় অর্জ্জন করা অসম্ভব,
যা ভাগ্যবলে দৈবাৎ মেলে—
রূপ এবং বংশ-গৌরব।
স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা অথবা অর্থ

লোভনীয় নয় মোটেই এঁদের কাছে।
সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী চান এঁরা।
বাবা মারা গেলেন হঠাৎ একদিন।
শোকে-তাপে
আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যাগমে
শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে
কাটল কিছুদিন।
আত্মীয়-স্বজনেরা চমকে গেলেন
শ্রাদ্ধের নূতনত্ব দেখে।
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায়
এলেন বেদজ্ঞ পুরোহিত
কাশী থেকে ;
ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এলেন
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণও ;
জাত-ব্রাহ্মণ নয়,
গুণ-ব্রাহ্মণ,
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী।
তার মধ্যে ছিলেন
দুইজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থও।
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে
অভ্যর্থনা করলে সে গুণীদের,
শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা দিলে
স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র, মাল্য-চন্দন এবং গ্রন্থ।
স্থানীয় লোকেরাও বাদ গেলেন না,
আপামরভদ্র সবাই
যোগ দেবার সুযোগ পেলেন একদিন

বিরাট ভূরিভোজনের মহোৎসবে।

বছরখানেক কাটল।
কর্ত্তব্যবোধেই সম্ভবত
আত্মীয়-স্বজনেরা আর একবার এলেন,
চেষ্টা করলেন বিয়ের।
সে সংক্ষেপে বললে,
বিয়ে করব না আমি।
কেন ?
রুচি নেই।
রুচিবিকার-সংশোধনে অসমর্থ ব'লে নয়,
লক্ষাধিক টাকার মালিক
বি, এ,-পাস এই মেয়েটা
তাঁদের শাসনসীমা-বর্ত্তিনী হ'তে
রাজী হ'ল না ব'লে
নিরস্ত হলেন তাঁরা।
আধুনিক শিক্ষাকে গাল পাড়তে পাড়তে
মুক্তকচ্ছ কম্পিতগুম্ফ হিতৈষীর দল
একে একে
অন্তর্দ্ধান করলেন আপন আপন বিবরে।

কাটল আরও বছর দুই।
অন্য কেউ হ'লে
এম. এ. দেবার চেষ্টা করত হয়তো,

নিতান্ত পক্ষে কিংবা
সময় কাটাবার জন্যেও অন্তত
শিক্ষয়িত্রীগিরি যোগাড় ক'রে নিত একটা।
এ কিন্তু করলে না কিছুই।
নোট-বই প'ড়ে
বাঁধা-ধরা নিয়মের পরীক্ষা পাস করাকে
চিরকালই সে
খোঁটায় বাঁধা গরুর
জাব খাওয়ার সঙ্গে উপমিত করেছে।
হাস্যকর নিয়মের খাঁচায় বন্দী হয়ে
মাস্টারি করার ছুতোয় তোতাগিরি করাটাও
চিরকাল অপছন্দ তার,
তাই ওসব করলে না কিছুই।
পড়া-শোনা অবশ্য বন্ধ রইল না।
তার 'মিণ্টো' বুক-কেসগুলোতে
ওয়ালনাট-টেবিলে
মেহগিনি-আলমারির তাকে তাকে
জমতে লাগল নানা বই নানা ধরনের।

কিন্তু—
হ্যাঁ,
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল ক্রমশ
মস্ত বড় একটা 'কিন্তু'।
মন ভরে না কেবল বই প'ড়ে
উপন্যাস যত ভালই হোক,

ক্লান্তিকর শেষ পর্য্যন্ত।
উপন্যাস ছেড়ে ধরল ইতিহাস—
ভারতের, চীনের, জাপানের,
রোমের, গ্রীসের, জার্মানীর, ইংলণ্ডের,
রাশিয়ার।
নাঃ,
মরা মানুষের মরা কাহিনী সব—
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা
তাও অনিশ্চিত।
কিনলে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই
কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জুওলজি ;
ভাল লাগল না।
কাণ্ট, হেগেল, এমার্স্ন,
রামায়ণ, মহাভারত, জাতক,
গীতা, উপনিষদ—
তাও বিস্বাদ।
পাঞ্চ, স্ট্র্যাণ্ড, নেচার,
লিটারারি ডিজেস্ট, প্যারেড,
ধর্ম্মতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি
কিছুই ভাল লাগে না আর,
এমন কি
হার মানলেন
হ্যাভ্‌লক এলিস, বাৎস্যায়ন পর্য্যন্ত।

নানা রকম ক্যাটালগ ওলটাতে ওলটাতে একদিন
উদ্দীপ্ত হ'ল কল্পনা—
ফলে
হাজার কয়েক টাকা বেরিয়ে গেল।
ক্রোমিয়মের ডিনার-সেট,
অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার টেবিল,
বাসন নানা রকম দামী চীনেমাটির,
নতুন মডেলের
কার, ক্যামেরা,
রেফ্রিজারেটার, রেডিও,
অভিনব খাঁচায়
অভিনব বর্ণের ক্যানারি এক ঝাঁক,
অভিজাত বংশের
অ্যালসেশিয়ান, স্প্যানিয়েল, পুড্‌ল।
কাটল কিছুদিন।
মনে হ'ল তারপর
কেন এসব? কার জন্য?
মনের ক্ষুধা তো মিটল না!

ছবি আঁকবার চেষ্টা করলে,
কিন্তু সার হ'ল সরঞ্জাম কেনাই।
তুলি, রং, কাগজ পেলেই হয় না শুধু,
প্রতিভা চাই।
ছবি হ'ল না।
ছেলেবেলায় একবার

কণ্ঠ এবং যন্ত্র-যোগে রীতিমত
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সে
সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করবার,
সফলকাম হয় নি।
সেদিক দিয়েও গেল না সুতরাং।

মনে হ'ল একদিন,
বাগান বানালে কেমন হয়?
ফুল নিয়ে কবিত্ব করার শখ
কোন দিনই তার ছিল না অবশ্য,
ফুল-চাঁদ-মলয়-মেঘ-মূলক কবি-বৃত্তিকে
প্রশ্রয় দেয় নি সে কোন দিনই।
আকাশের চাঁদ দেখে সে যতটা না মুগ্ধ হ'ত,
তার চেয়ে ঢের বেশি মুগ্ধ হ'ত
বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতিটা দেখে।
কি উজ্জ্বল আলো তার,
গঠনে কি বর্ণ-বৈচিত্র্যশোভা!
বেশি আবিষ্ট করত তার মনকে
সিনেমার দৃশ্য
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে,
গহন বনের সৌন্দর্য্যের চেয়ে
বেশি অভিভূত করত
বিরাট ফ্যাক্টরির সৌন্দর্য্য।
সেকেলে কবিদের নকল ক'রে
যন্ত্রকে—

মানব-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে
দানব ব'লে উপহাস করতে
সঙ্কুচিত হ'ত সে।
মনে হ'ত
ওই জাতীয় উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে
পলায়নী মনোবৃত্তি,
অক্ষমতার শূন্য আস্ফালন।
তাই তার বাগানের শখ
মূর্ত্ত হ'ল
নানা রকম সারে, যন্ত্রে,
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।
ফুল ফুটল নানা রকম দেশী-বিদেশী,
ফসলও ফলল বহুবিধ
শাক-সবজি তরি-তরকারির,
বামন গাছ
অর্কিড,
সিজ্‌ন-ফ্লাওয়ার হরেক রকমের,
হরেক রকমের পরীক্ষা
গাছেদের বর্ণ-সঙ্করত্ব নিয়ে,
পরাগ-বিনিময়
কলম-তৈরি
বাকি রইল না কিছুই।
তবু কিন্তু মন ভরে না।
মনে হয় ক্ষুধিত আছি,
মনে হয় আসল জিনিস পাওয়া যায় নি,
যাবেও না কখনও বোধ হয়।

ক্ষতি কি হয়েছে তাতে ?
মনকে জোর ক'রে বোঝাতে হয়,
সুখেই তো আছ ;
জোর ক'রে মানতে হয়,
হ্যাঁ, সুখেই আছি ।
কিন্তু ওই ছোট কুঁড়েঘরে
মালীর সদ্যোজাত শিশুটা যখন কেঁদে ওঠে,
তখন ঝন ঝন ঝনাৎ ক'রে
আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে
মনের সমস্ত তারগুলো যেন ।
এ কি অত্যাচার !
মাতৃত্ব কামনা করি ব'লে
ধরা দিতেই হবে পুরুষের বাহুপাশে ?
ফুলকে তো ধরা দিতে হয় না,
সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে
পতঙ্গের পাখায় পাখায় বাহিত হয় সৃষ্টির বীজ ।
মানুষ এখনও এত বর্ব্বর ?
জলের কুঁজোটাকে বিয়ে না করলে
পিপাসার জল পাব না ?

নিঃশব্দে পাখা ঘুরছে ।
নিঃশব্দে জ্বলছে সুদৃশ্য-ডোমে-ঢাকা বিদ্যুৎ-বাতিটা,
সামনের থাবা দুটোয় মুখ রেখে
নিঃশব্দে ব'সে আছে স্প্যানিয়েলটা,
সে পদ-চারণা ক'রে চলেছে নিঃশব্দে ।

ভাবছে, অশোভন হবে কি
ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটা ?

সব শুনে বললেন ডাক্তার,
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি কেন ?
রুচি নেই।
রুচি বদলান।
বদলাবার ইচ্ছে নেই,
নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে চাই না
একদিনের জন্যেও ;
কিন্তু ছেলে চাই,
উপায় নেই কোন ?
উপায় আছে বই-কি,
টেস্ট টিউব বেবি—
বিজ্ঞানের যুগ এটা
সবই সম্ভব।

সম্ভব হ'লও !
প্রত্যক্ষ-ভাবে পুরুষ-সংস্রবে না এসেও
সন্তান-সম্ভবা হ'ল সে।
গভীর রাত্রে হঠাৎ একদিন
ঘুম ভেঙে গেল তার।
ম্যুরিলোর আঁকা
ইম্‌ম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন ছবিখানা
স্বপ্নে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট সে।

অনন্ত আকাশের বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী জননী,
পদ-প্রান্তে সরু একফালি চাঁদ,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা সব—
দেবশিশুরা
ভিড় ক'রে আছে চারিদিকে
কেউ স্পষ্ট, কেউ অস্পষ্ট।
মনে পড়ল কুন্তীর কথা
জবালার
সীতার
দ্রোণের,
মনে পড়ল ইসাডোরা ডান্‌কান—
টং ক'রে একটা বাজল।
অস্পষ্ট ঘর্ঘরধ্বনি ভেসে এল যেন কোথা থেকে—
বিমান-পোতে কে আসছে এত রাত্রে!

বার্ত্তা চাপা রইল না বেশিদিন।
যথানিয়মে
হিতৈষী আত্মীয়েরা এলেন আবার অনাহূতভাবেই।
যথানিয়মেই
ফুসফুস-গুজগুজও হ'ল,
ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম মহাপুরুষও একজন সম্ভব হলেন
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়।
টলল না কিন্তু সে;
বললে স্থিরকণ্ঠে,

পাপ করি নি কিছু,
নারীজীবনের চরম-সার্থকতা যে মাতৃত্বে
তাই অর্জ্জন করতে যাচ্ছি
আধুনিক পদ্ধতিতে
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নিয়ে
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে।
আপনারা আমাকে রেহাই দিন।

টাকা আছে প্রচুর,
রেহাই দিতে হ'ল সুতরাং।

ছ' মাস কাটল।
ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন একদিন,
চমকে গেলেন ঃ
আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা
আগে লক্ষ্য করেন নি তিনি,
পেল্‌ভিস ভয়ানক ছোট
স্বাভাবিক প্রসব অসম্ভব।
অপরিণত শাবকটিকে ধ্বংস না করলে
মায়ের জীবন সংশয়!
মুখ শুকিয়ে গেল তার।
অন্য কোন উপায় নেই ?
আছে—সিজারিয়ান সেক্‌শন।
পেট কেটে ছেলে বার করা যেতে পারে,
কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা!

সে বিপদের সম্মুখীন হবে—
আত্মরক্ষা ও আত্মবিনোদনই আধুনিকতা নয়,
দুর্জ্জয়কে জয় করবার সাহসই আধুনিকতা।

অবশেষে এল সেই দিন।
ঠিক করাই ছিল সব—
রবার-প্যাড দেওয়া অপারেশন-টেবিল,
আরও দুটো টেবিলে
তোয়ালে, ক্যাথিটার, কাঁচি, লোশন,
টাওয়েল, ফর্‌সেপ্‌স্‌,—সারি সারি ওষুধ।
জল গরম করবার ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ,
সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্নানের টব,
ইলেক্‌ট্রিক রেডিয়েটার একটা,
হাই-পাওয়ার বাল্‌ব চারটে,
ত্রুটি ছিল না কিছু।
ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গেই
এসে পড়লেন ডাক্তারেরা
একজন সার্জন—দুজন সহকারী।
নার্স দুজন আগেই এসেছিল
প্রাক-অপারেশন ব্যবস্থা করবার জন্যে।
ডাক্তারদের সঙ্গে এল
গোটা চারেক বড় বড় ড্রাম,
কোনটাতে যন্ত্রপাতি
কোনটাতে ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো
কোনটাতে ডাক্তারদের পোশাক

স্টেরিলাইজ্‌ড্‌ আধুনিক পদ্ধতিতে।
স্পাইনাল অ্যানিস্‌থিসিয়া দেওয়া হ'ল।
ডাক্তাররা হাত ধুলেন,
পরলেন তাঁদের অদ্ভুত অটোক্লেভ্‌ড্‌ পোশাক—
লম্বা গাউন পা পর্য্যন্ত,
নাক-মুখের আচ্ছাদন,
মাথায় টুপি,
হাতে রবারের দস্তানা।

চুপ ক'রে শুয়ে রইল সে মুখ বুজে,
মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

জ্ব'লে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্‌গট ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর
শুরু হ'ল অপারেশন।
করকর ক'রে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেলাম দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।
ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জেনের গাউনে এক পিচকিরি রং দিয়ে দিলে যেন কেউ।
কট কট কট—
আর্টারি ফর্‌সেপ্‌স্‌ চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ

নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল

বাইরেও তখন ফিনিক ফুটছিল জ্যোৎস্নার
চন্দ্রমল্লিকার স্তবকে স্তবকে
রজনীগন্ধার গুচ্ছে গুচ্ছে
চামেলী-কুঞ্জে
যূথিকা-বনে
ঝিল্লির অশ্রান্ত একটানা সঙ্গীতে
জ্যোৎস্না-ধবল মেঘমালায়
মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল সেই চিরন্তন সত্য—
সৃষ্টি কি সুন্দর!

সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে
সচকিত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক।
সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক
সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে
প্রবেশ করল আধুনিক জগতে
চির-পুরাতন চিরনূতন শিশু।

ভাই অসিত,

তোমার স্ত্রী কি তোমার কাছে বা তোমাদের বাড়ীতে ফিরে গেছে? চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় চিঠি আমি লিখি না। হাসির হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে বিস্মিত (এবং একটু বিচলিতও) হয়েছি বলে লিখছি। হস্টেলের মাসীমা বললেন, হাসি কাউকে কিছু না বলে' হস্টেল থেকে চলে গেছে। তোমার শ্বশুর মশায়ের ঠিকানাটা জানা ছিল। সেখানে গেলাম। খবরটা শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। হাসির হঠাৎ হোস্টেল ত্যাগ করার কোন সদর্থই করতে পারলেন না ভদ্রলোক। আমতা আমতা করলেন একটু, মুচকি মুচকি হাসলেন দু-একবার—এ ফানি সর্ট অব জেন্টল্‌ম্যান হি সিমড—এক্‌স্‌কিউজ মি—যা মনে হয়েছে সরলভাবে বলে ফেললাম। শেষকালে বললেন, "না, আমি তো কিছুই জানি না। হয়তো অসিতের কাছে গেছে, কিম্বা অসিতের বাপমায়ের কাছে, ঠিক জানি না—"

খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। বোর্ডিংয়ের দারোয়ানের কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হল—এক্‌স্‌কিউজ মি ইফ্‌ আই হার্ট ইওর ফীলিংস্‌—মনে হল হাসি আত্ম-আবিষ্কার করেছে। ও যে করবে তা ওকে একদিন দেখেই আমি বুঝেছিলাম।' যে খাঁচার মোহ আমাদের সকলকে সম্মোহিত করে রেখেছে তা ওকে ভোলাতে পারে নি। অজানা আকাশ থেকে যে মুহূর্ত্তে ও সত্য ডাকটি শুনেছে সেই মুহূর্ত্তেই ও ডানা মেলে উড়ে গেছে। বিয়ের মন্ত্র ওর পায়ের শিকল হয়ে ওঠেনি। প্লীজ স্ট্রেচ ইওর ইম্যাজিনেশন্‌—তুমি কবি, সত্যকার স্রষ্টা হও, তাকে বোঝ, হা-হুতাশ কোরো না।

অন্ধকার 'সেলে' পচে পচে মরছি, তিলে তিলে মরছি, হঠাৎ যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে উল্কার মতো, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে সমস্ত গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে। দিস্ ইজ্ অ্যান ইভেণ্ট, এ গ্লোরিয়াস ইভেণ্ট....।

এই পচা-ধসা সংস্কারের শ্যাওলা-পড়া সমাজের মুখে লাথি মেরে হাসি যে চলে যেতে পেরেছে এর জন্য তাকে নমস্কার করি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি অমন একটি মেয়েকে সহধর্ম্মিণীরূপে পেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে তোমার মধ্যে সহধর্ম্মীকে খুঁজে পেল না। পাবার কথাও নয়। তুমি ভদ্র, তুমি দয়ালু, তুমি ধনবান, তুমি তথাকথিত সভ্যসমাজের শোভন পুতুলটি। ঝড়ের রাতে যার অভিসার তার যোগ্য সঙ্গী হবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? অনেক কথা লিখে ফেললুম। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। যা লিখতে যাচ্ছি তাতেই যেন উলটো সুর বেজে উঠছে। আমার সমস্ত কল্পনা জুড়ে যে উদ্দাম অর্কেস্ট্রা বাজছে এখন তার সঙ্গে তোমার মনের সুর মিলবে না। নেভার মাইণ্ড, চীয়ার আপ।

অতুল

২৭

ভাই অসিত,

তোমার পত্র পাইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। চিন্তার কথা তো বটেই। তোমাকে পূর্ব্বপত্রে জানাইয়া ছিলাম যে, শনিবার দিন অফিস-ফেরতা গিয়া হাসিকে লইয়া আসিব। দুইটা নাগাদ হোস্টেলে পৌঁছাইয়া খবর পাঠাইলাম। একটু পরে স্বয়ং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাহির হইয়া আসিলেন। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে বেশ একটু রুক্ষ, ভাব

লক্ষ্য করিলাম। আমার দিকে একনজর চাহিয়া বলিলেন, "হাসি হোস্টেলে নাই।" তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল কোথায় গিয়াছে, কখন ফিরিবে। "জানি না" বলিয়া তিনি গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি বেশ একটু অপমানিতই বোধ করিয়াছিলাম। কাল তোমার চিঠি পাইয়া ভিতরের কথা বুঝিতে পারিলাম। চিত্রা তো আকাশ হইতে পড়িয়াছে, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িতে হইল। একটা খোঁজ তো করিতে হইবে। আবার হোস্টেলে গেলাম। দারোয়ান বাবাজীকে একটি টাকা ঘুস দিয়া চেষ্টা করিলাম যদি গোপন কোনও খবর বাহির করিতে পারি। পারিলাম না। সে বলিল—একটি ছোট স্যুটকেশ হাতে করিয়া হাসিদিদি একটা ট্যাক্সি চড়িয়া একাই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে সে তাহা জানে না। শতমুখে সে হাসির প্রশংসা করিল। কহিল—একদিনও তাহার কোনও বেচাল সে দেখে নাই। দেখিবার কথাও নয়। চিত্রা বলিল, হাসি হয়ত হোস্টেলের মাসীমার সহিত ঝগড়া করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কথাটা মনে লাগিল। হাসির বাবা নীলাম্বরবাবুর সহিত কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। তাঁহার বাসার ঠিকানাটা জানা ছিল। সোজা সেই ঠিকানাতেই চলিয়া গেলাম। আশা ছিল হাসিকে হয়তো সেইখানেই দেখিতে পাইব। কিন্তু ভাই, হতাশ হইতে হইল। হাসি তো সেখানে ছিলই না, নীলাম্বরবাবুও ছিলেন না। শুনিলাম—ঐ বাসার লোকেরাই বলিল—তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে একাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে হাসি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই; তখন ভাবিলাম হাসি হয়তো একাই বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আজকাল অনেক মেয়েই তো একা

একা সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। ইহার পর কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। চিত্রা বলিল, আমাদের সদানন্দবাবুকে (অফিসের বড়বাবু) সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি হয়তো কোনও সৎ পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষ করিয়া তিনি নীলাম্বরবাবুর বাল্যবন্ধু বলিয়া আমি আরও উৎসাহিত হইয়া সেখানে গেলাম। খবরটা শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"এই রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম, নীলাম্বর শেষ রক্ষা করতে পারলে না তাহলে—!" বুঝিতেই পারিতেছ এই ধরনের বাঁকাচোরা কথা শুনিয়া আমি বেশ একটু অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। বলিলাম "ব্যাপারটা কি আমাকে যদি খুলে বলেন আমি অসিতকে জানিয়ে দিতে পারি। অসিত বেচারা বড়ই চিন্তিত হয়েছে।" আমার কথা শুনিয়া বড়বাবু উঠিয়া গেলেন এবং আলমারি হইতে একটা চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন—"এই চিঠির বাণ্ডিলটা তোমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দাও, তা হলেই সে সব বুঝতে পারবে"—তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন—"লিখে দাও চিঠিগুলো পড়ে' যেন পুড়িয়ে ফেলে। ও আর আমাকে ফেরত দিতে হবে না।" বড়বাবুর মুখটা কেমন যেন থম্ থম্ করিতে লাগিল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, বাণ্ডিলটি লইয়া চলিয়া আসিলাম। বাণ্ডিলটি আজ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। বড়বাবু যেমন সীলড দিয়াছেন তেমন পাঠাইয়াছি। বিশ্বাস কর, খুলিয়া দেখি নাই। সীল দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। খুবই কৌতূহল হইতেছিল কিন্তু ভাবিলাম গুরুতর কোনও বাধা যদি না থাকে তুমি নিজেই আমাকে জানাইবে। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম। ভয় করিও না, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি—

মহেন্দ্র

নীলাম্বরবাবুর পত্রাবলী

মুঙ্গের

১০-১-২৮

ভাই সদানন্দ,

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছ সামাজিক দিক হইতে তাহার মূল্য আছে স্বীকার করি। আমরা সামাজিক জীব, সামাজিক নিয়মাবলীও যতটা সম্ভব আমাদের মানিয়া চলা উচিত একথাও অস্বীকার করিতেছি না। আমি কেবল একটি প্রশ্নই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। আমরা কি কেবল সামাজিক জীবই? এতদপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপকতর পরিচয় কি আমাদের নাই? উপনিষদ আমাদের যে সত্তার কথা আলোচনা কবিয়াছেন, তাহা কি বিশেষ কোন সমাজের সত্তা? তাহা কি সর্ব্বমানব সম্বন্ধেই সত্য নয়? উপনিষদের ঋষির বাণী—'আমি আমার মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের মধ্যে আমাকে উপলব্ধি করিব'। লিলির সম্বন্ধে এ-বাণীর অন্য অর্থ যদি করি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের উপনিষদ পাঠ ব্যর্থ হইয়াছে। তোমার অধরে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, মানস-নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি করিব বল, যাহা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছি তাহা তোমার নিকট অন্তত ব্যক্ত না করিয়া পারিতেছি না। উপনিষদের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, নিছক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি লইয়াই যদি বিচার করি, তাহা হইলেও লিলিকে অপাংক্তেয় মনে করিবার কোনও হেতু খুজিয়া পাই না। তুমি যে সমাজের দোহাই পাড়িতেছে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সে সমাজের যে চেহারা ছিল আজ কি তাহা আর আছে? এখন কি আর সতী-দাহ

চলিবে? কিন্তু যে সকল তত্ত্ব ডারবিনের বিবর্ত্তনবাদকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সামান্য ইতর-বিশেষ হয়তো হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক কাঠামোটা ঠিক আছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়াও যদি ভাব লিলিকে অযোগ্যা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কুলশীলের পরিচয় জানা না থাকিলেই কি তাহাকে কুলটা বা দুঃশীলা মনে করিতে হইবে? লিলির চোখে মুখে কি তাহার আভিজাত্য পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই? আমার বিশ্বাস সে যদি কথা কহিতে পারিত তাহার প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতাম। কাগজে বারম্বার বিজ্ঞাপন দিয়াও যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, থাকিলেও তাহারা দায়িত্ব লইতে চাহে না। এ অবস্থায় কি করা উচিত? আমার মনে হয় দায়িত্ব আমাদেরই। কুম্ভ মেলায় গুণ্ডাদের হাত হইতে আমরা যখন তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি তখন উহার ভার আমাদেরই লইতে হইবে। তুমি শেষে যে কথাটা লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া হাসি পাইতেছে। লিলি নামটাতে তোমার এত আপত্তি কেন? লিলির মতো সুন্দর দেখিতে বলিয়াই আমি লিলি নাম দিয়াছিলাম। তুমি বলিতেছ হিন্দু নাম রাখা উচিত, লিলি নামটাতে বিলাতী গন্ধ আছে। তোমার যে এ ধরনের শুচি-বায়ু আছে তাহা জানিতাম না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—উহার লিলি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যদি কালী বা দুর্গা নাম রাখা যায় তাহা হইলে কি সমস্যার সমাধান হইবে? যদি হয় নাম পরিবর্ত্তন করিতে আমার আপত্তি নাই। পরিশেষে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তোমার পত্র পড়িয়া সন্দেহ হইতেছে তুমি কি সেই সদানন্দ যে একদা সাহেবী হোটেলে বসিয়া মহানন্দে বীফ স্টিক্ চর্ব্বণ করিয়াছিলে? রাগ করিও না ভাই, যাহা মনে হইল লিখিলাম। লিলির সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি ঠিক করিলে

তাহা জানাইবে। অদ্য মনিঅর্ডার যোগে তোমাকে পঞ্চাশ টাকাও পাঠাইলাম। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর।

২

মুঙ্গের
১৭-১-২৮

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে সব মবাল লেকচার দিয়াছ তাহাতে কোনও সার বস্তু নাই, কেবলই ফেনা। সোডা ওয়াটারের বোতলে, অর্দ্ধশিক্ষিতদের সভায় অথবা শস্তা প্রেমের উপন্যাসে ফেনা বেমানান নয় কিন্তু যে গুরুতর সমস্যা লইয়া তুমি আলোচনার ভান করিয়াছ তাহাতে উচ্ছ্বাসের স্থান নাই। যুক্তি চাই। ভান করিয়াছ বলিয়াই যুক্তির অবতারণা করিতে পার নাই। যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করে তাহার ঘুম ভাঙানো শক্ত। তুমি যদি মেয়েটির দায়িত্ব না লইতে চাও, লইও না। না লইবার বহুবিধ সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, দুই-একটা কারণ তুমি উল্লেখও করিয়াছ। তোমার বাড়ীর লোক, বিশেষ করিয়া তোমার বাবা, মেয়েটিকে আর তোমার বাড়ীতে রাখিতে চান না, আমি তো মনে করি এই একটা কারণই যথেষ্ট। তিনি যদি তাঁহার বাড়ীতে কোন অজ্ঞাতকুলশীলাকে আশ্রয় না দিতে চান তাঁহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তুমি যদি এই কথাটাই কেবল লিখিতে আমার কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু তুমি

এমন একটা ভাব দেখাইয়াছ যেন ব্যাপারটা যদি তোমারও বিবেকসঙ্গত হইত তাহা হইলে তোমার বাবার মত অগ্রাহ্য করিয়াও লিলিকে তুমি তোমাদের বাড়ীতে রাখিতে। বিবেকের স্বপক্ষে নানারূপ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া তুমি যে ধরনের ওকালতি করিয়াছ তাহা কোনও অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরোহিতের মর্ম্ম হয়ত স্পর্শ করিতে পারে, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে তোমার পত্রটি পঠিত হইলে প্রবীণ সমাজপতিদের হাততালিও হয়ত তুমি লাভ করিবে, কিন্তু ওসব কথা বলিয়া আমাকে তুমি ভুলাইতে পারিবে না। আমাকে তুমি কি চেন না? তবে কেন বৃথা কালী, কাগজ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিয়াছ? তোমার পত্র পড়িয়া একটা কথা আমার মনে হইতেছে। মনে হইতেছে যে তোমার বিবেক আমারই পক্ষে আছে। কিন্তু তুমি ভীতু। তুমি পিতার বিরাগ, সামাজিক গোলমাল প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে ভয় পাও, শুধু তাহাই নয়, তুমি যে ভয় পাও একথা আমার নিকট অকপটে স্বীকার করিতে তোমার লজ্জাও হয়। তাই তুমি ওই সব রাবিশ মরাল লেকচার দিয়াছ।

এইবার কাজের কথা পাড়ি। তুমি তো জান বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ীটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার নিজের বলিতে আপাতত কেহ নাই, সে জন্য বাড়ীরও দরকার নাই। কলিকাতায় গেলে মেসে থাকি, দেশে আসিলে মনু মাসী আমাকে আশ্রয় দেন। আমার নিজের বাড়ি থাকিলে লিলিকে নিশ্চয়ই সেখানে আশ্রয় দিতাম। মনু মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিও আশ্রয় দিতে রাজী নন। তুমিও যখন অপারগ হইয়াছ তখন মেয়েটিকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া ছাড়া আর একটি মাত্র উপায় আছে। আমি নিজে তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়া অন্য কোথাও তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। সে রকম ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে সে চিন্তাও আমি করিয়াছি। প্রথম এবং প্রধান কথা টাকা, তাহা আমি ব্যয়

করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি তাহাকে মূক-বধিরদের স্কুলে ভরতি করিয়া দাও। শুনিয়াছি সেখানে থাকিবার বোর্ডিং আছে। সেই বোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষদের সহিত দেখা করিয়া লিলির সেখানে থাকিবার বন্দোবস্তটুকু আশা করি তুমি করিয়া দিতে পারিবে। ইহাতে আশা করি তোমার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। লিলির কাপড় চোপড় এবং ট্রাঙ্ক কিনিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছি। অদ্য পুনরায় একশত টাকা পাঠাইলাম। যদি আরও লাগে পাঠাইয়া দিব। এই অজ্ঞাত কুলশীলার জন্য আমি কেন এত টাকা অনর্থক খরচ করিতেছি এ প্রশ্ন তোমার মনে যদি জাগে তাহা হইলে তোমার সম্পর্কে আমার নিজের আচরণের কথা স্মরণ করিও, তাহা হইলেই উত্তর পাইবে। রেসের মাঠে তোমার হইয়া টিকিট খরিদ করিবার কোনও সদর্থই কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি করিতে পারিবেন না। আমার কাছে কিন্তু ইহার একটি সহজ অর্থ তখনও ছিল, এখনও আছে। আমি সুখ পাইয়াছিলাম। আশা করি লিলির একটা সুব্যবস্থা তুমি করিয়া দিতে পারিবে। আমি জ্বরে শয্যাগত আছি তাহা না হইলে আমি নিজেই চলিয়া যাইতাম। আমার ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

মুঙ্গের

২-২-২৮

ভাই সদানন্দ,

লিলিকে মূক-বধিরদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ফর্ম্মগুলি তুমি সহি করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছ তাহা এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। তুমিই যদি উহার গার্জ্জেন হইয়া ফর্ম্মগুলিতে সহি করিয়া দিতে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হইয়া যাইত? আমি যখন টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি নিশ্চয়ই দিব। আচ্ছা লোক তো তুমি! হঠাৎ এমন সাবধানী হইয়া উঠিলে কেন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি লিখিয়াছ, "লিলির সহিত যে আমার কোনও সম্পর্ক আছে, বা কোনওকালে ছিল তাহার কোনও প্রমাণ কাগজে কলমে আমি রাখিতে চাই না। তুমিই যখন তাহার সমস্ত ভার লইতেছ, তখন তুমিই তাহার গার্জ্জেন হও।" আইনত কথাটা ঠিকই, কিন্তু তোমার মতির এরূপ গতি হইল কেন ভাবিয়া পাইতেছি না। আমাদের বন্ধু যোগেন ডাক্তারকে দিয়া তোমার ব্লাড প্রেসারটা মাপাও। আর একটা কাজের কথাও তোমাকে লিখিতেছি। তুমি এখন হিসাবী লোক হইয়াছ, আশা করি ইহার একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমার ব্যাঙ্কে নগদ টাকা বিশেষ কিছু নাই। যাহা ছিল তাহা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। আমার ইচ্ছা আমার মায়ের ঠাকুমার দিদিমার এবং আরও অনেকের যে সব গহনা উত্তর-অধিকার-সূত্রে আসিয়া আমার সিন্দুকে জমিয়া আছে সেগুলিকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিই। সমস্ত বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নিশ্চয় হইবে। তুমি যদি ব্যবস্থা করিতে পার ভাল হয়। আমি

এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোথায় গিয়া কাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে সুবিধা হইবে আমার জানা নাই। তোমারও জানা আছে কি-না জানি না, কিন্তু তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু তাই তোমাকে লিখিলাম। তোমার আজকাল মরাল লেক্‌চার দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে জানিয়াও লিখিলাম। তুমি হয়তো লিখিবে, মা, দিদিমা, ঠাকুমার স্মৃতিচিহ্নগুলি এমনভাবে নষ্ট করা বর্ব্বরতা। হয়তো আমি বর্ব্বর। আমার সহজ বুদ্ধি কিন্তু আমাকে বলিতেছে যে অতগুলি গহনা অকারণে বাক্সে পুরিয়া রাখার কোনই সার্থকতা নাই। ওগুলিকে যথোচিত সাবধানতা সহকারে রাখিবার সামর্থ্যও আমার নাই। মনু মাসীর বাড়ীতে যদি ডাকাতি বা চুরি হয় (কিছুই বিচিত্র নয়) তাহা হইলে আমার কিছুই বলিবার থাকিবে না। ওগুলি বিক্রয় করিয়া টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখাই নিরাপদ। তা ছাড়া, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার টাকার দরকার। আর এম. এ. পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা নাই। একটা এম. এ. ডিগ্রি তো আছে, ডবল এম. এ. হইয়া আর কি হইবে? চাকরি করিবার বাসনা নাই। কোনও ব্যবসায় করিব। কিন্তু কিসের ব্যবসায় কোথায় করিব তাহা এখনও অনিশ্চিত। মনু মাসী বলিতেছিলেন মেসোমশায়ের কাশীতে যে জুয়েলারি দোকানটি আছে লোকাভাবে এবং দেখা-শোনার অভাবে সেটি নাকি তেমন চলিতেছে না। আমি যদি সেটির ভার লই তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হন। মেসোমশাই যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন দোকানটির নাম ডাক ছিল। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন। মনু মাসীর জামাইটি মাত্র সম্বল। মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে জামাই আপনজন হইত, হয়তো পব-জামাই হইতে পারিত, কিন্তু এখন তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া পর-জামাই হইয়া গিয়াছেন। মনু মাসী বলিতেছেন যে, দোকানটি আমি যদি চালাইতে পারি আমাকেই তিনি লেখা-পড়া করিয়া সমস্ত স্বত্ব দান করিয়া দিবেন। আমি যে জহুরী লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—

অহেতুক বিনয় আমি করি না—কিন্তু মুশকিল হইয়াছে আমার জহুরীর যে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তাহার মধ্যে জুয়েলারি দোকানের স্থান নাই। শেক্‌স্‌পীয়র মিলটন গ্যেটে কালিদাস ভবভূতি রবীন্দ্রনাথ হইতে শুরু করিয়া উদীয়মান কবি কাজি নজরুলের পর্য্যন্ত স্থান সেখানে আছে কিন্তু জুয়েলারী দোকানের নাই। কিন্তু মনু মাসীর কথা শুনিয়া লোভ হইতেছে। কি করি বল দেখি? নূতন ধরনের এই রেস খেলায় ঝাঁপাইয়া পড়িব নাকি! বাজে ঘোড়াকে ব্যাক করিয়া জীবনে অনেক রেসে হারিয়াছি, আর একবার হারিতেও লজ্জা নাই। মনু মাসীকে কিন্তু বাজে ঘোড়া বলিয়া মনে হয় না। তুমি নিশ্চয় চটিয়া এতক্ষণ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছ। আমি ভাই অসহায় ব্যক্তি, আমার উপর রাগ করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না। ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ! লিলির কাছে আর গিয়েছিলে কি? মাঝে মাঝে খবর লইও। ইতি

তোমারই—

নীলাম্বর

৪

দিল্লী

৪-৩-২৮

ভাই সদানন্দ,

আমি কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিতে পারি নাই, কারণ একটি টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে পরের ট্রেনেই দিল্লী চলিয়া আসিতে হইয়াছে। টেলিগ্রাম কে করিয়াছিল জান? চুনী। চুনীকে মনে পড়িতেছে না? আমাদের সেই বেনেটোলার

বেণী-দোলানো চুনী, যাহার বাবা চাকরির লোভে খৃস্টান হইয়াছিলেন। এইবার আশা করি মনে পড়িয়াছে। সেই চুনী হঠাৎ এতদিন পরে আমাকে বাড়ীর ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল—অন ডেথ বেড, প্রে কাম ওয়ান্স। মনু মাসী সেই টেলিগ্রাম কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কি কাণ্ড দেখ। টেলিগ্রামের ওই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যেই রোমান্সের গন্ধ আছে। রোমান্সই। চুনীকে ঘিরিয়া অনেকের মনেই একদা রোমান্স জাগিয়াছিল, আমারও জাগিয়াছিল। তোমার মনের স-ঠিক খবর জানি না, কিন্তু তুমি যে তাহাকে ভুল বাংলায় শেলী কীটস ব্রাউনিংয়ের কবিতার রসাস্বাদন করাইবার চেষ্টা করিতে এই খবরটি আমার অজ্ঞাত ছিল না, চুনী আমাকে একদিন বলিয়াছিল, তোমার অনুবাদ আমাকে দেখাইয়াও ছিল, সেই জন্য সন্দেহ হয় যে তুমিও হয়তো মজিয়াছিলে। একটা কথা কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না। চুনী আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। এখন হইলে বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তখন বাবা বাঁচিয়াছিলেন। বাবার চটিজুতা দুই একবার পৃষ্ঠস্পর্শ করিয়াছিল সে স্মৃতিও মনে জাগরূক ছিল। সুতরাং সাহস করি নাই। চুনীর আবেগময় উক্তির উত্তরে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার মনে আছে। বলিয়াছিলাম—"দেখ চুনী, ক্ষমতা থাকিলে আমরা দুইজনে প্রজাপতি হইয়া অনন্তের উদ্দেশ্যে পাশাপাশি উড়িয়া যাইতাম। সে ক্ষমতা যখন নাই তখন এস আমরা মনে মনে উড়ি। বিবাহের লাগাম দিয়া প্রজাপতিকে অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। গুড বাই।" তাহার পর আর চুনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র অবশ্য চলিত। এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল এ খবরও পাইয়াছিলাম। তাহার পর অনেক দিন আর কোনও খবর পাই নাই। সহসা এই টেলিগ্রাম। তোমাকে বলিয়া আসিবার সময় ছিল না। দিল্লীতে আসিয়া দেখিলাম

একটি জরা-জীর্ণা বৃদ্ধা মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চক্ষু কোটরগত, মাথার সম্মুখ দিকটা টাক-পড়া, ক্রমাগত কাসিতেছে। যে ঘরে শুইয়া আছে সে ঘরটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে।

আসবাবপত্র সাহেবী ধাঁচের, কিন্তু খুব ময়লা এবং জীর্ণ। তাহার ঘরে বৃদ্ধ বকাকৃতি একটি সাহেব বসিয়াছিলেন, তিনিই মিস্টার জোনস্, চুনীর স্বামী। আমাকে দেখিয়া চুনী বলিল, "আপনি এসেছেন নীলাম্বর-বাবু? আশা করিনি যে আপনি আসবেন। আপনাকে একবার শেষ দেখা দেখবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই ধার করেও ওই টেলিগ্রামটা করেছিলাম। কিন্তু আশা করতে পারিনি যে আপনি আসবেন। আমার কি দশা হয়েছে দেখুন নীলাম্বর বাবু"—ছোট খুকীর মতো সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মিস্টার জোনস্ বকের মতো নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটি কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। পরে জানিয়াছি লোকটি বদ্ধ কালা। কানের ভিতর ঘা হইয়া কালা হইয়া গিয়াছেন এবং এইজন্য চাকরিও গিয়াছে। চুনীর উপর্য্যুপরি চারটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। চুনীর হইয়াছিল যক্ষ্মা। শুনিলাম অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। আমাকে অবশ্য চুনী ডাক্তার ডাকিতে বলে নাই। মিস্টার জোনস্ কেবল মধ্যে মধ্যে ধীর কণ্ঠে বলিতেছিলেন "দি সিচুয়েশন ইজ ভেরী ভেরী ডেসপারেট"। আপন মনেই বলিতেছিলেন, আমাকে কিছুই বলেন নাই। আমি কিন্তু ভাই, নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলাম না, ডাক্তার ডাকিলাম। ভাল ডাক্তারই ডাকিলাম একজন। তিনি বলিলেন, "বাঁচিবার কোনও আশা নাই। তবে যে কয়দিন বাঁচেন, কষ্টটষ্টগুলা কমাইবার জন্য ঔষধ দিতে পারি। এ রোগ সারিবে না!" আমি আসিবার পর চুনী পাঁচদিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। কাল সে মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমাকে বলিয়া গেল—"জীবনের শেষ ক'টা দিন আপনি অমৃতে পরিপূর্ণ করে' দিলেন নীলাম্বরবাবু। এই আনন্দের স্মৃতি যদি মৃত্যুর

পরও থাকে তা হলে তারই জোরে আমি অনন্ত স্বর্গলাভ করব, আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই। আমি জীবনে একমাত্র আপনাকেই চেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল অসম্ভবকে চেয়েছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাও সম্ভব হল। এখন আপনাকে যেমন ক'রে পেলাম তেমন ক'রে বোধ হয় কেউ পায়নি আপনাকে।" ইহাই আমার সহিত তাহার শেষ কথা। চুনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বকটি উড়িয়া গেল। তাহার শেষকৃত্যও আমাকেই করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোনস কোথায় যে উবিয়া গেলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি শবানুগমন পর্য্যন্ত করেন নাই। চুনীকে গোর দিবার সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোনসের যে দুই-একজন আত্মীয় পাশাপাশি ছিলেন তাঁহারা অবশ্য কায়িক সাহায্য যথেষ্ট করিয়াছেন, আর্থিক দিকটা আমাকেই সামলাইতে হইয়াছে। এমন কি, চুনীর যে সব ধার ছিল তাহাও শোধ করিয়াছি। ছয় মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি ছিল, বাড়ীওয়ালা আসিয়া আমাকেই ধরিল। বলিল, মিস্টার জোনস্ বলিয়া গিয়াছেন যে আমি নাকি তাঁহার দূর-সম্পর্কের বড়লোক আত্মীয়, আমিই সব মিটাইয়া দিব। বাক্যব্যয় না করিয়া সব মিটাইয়া দিলাম। জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অন্য উপায় ছিল না। সমস্ত ব্যাপার যখন মিটিয়া গিয়াছে তখন মিস্টার জোনসের সহিত হঠাৎ একদিন দেখা হইল একটা চায়ের দোকানে। তিনি বকের মতো বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা আকৃতির নানা জাতের একদল লোক দাঁড়াইয়াছিল। আমি কাছে গিয়া দেখিলাম তিনি লিখিয়া লিখিয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। সকলে লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে এবং তিনি লিখিয়া লিখিয়া উত্তর দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে মাত্র চারি আনা পয়সার বিনিময়ে তিনি সকলকে রেসের 'টিপ' দিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি নাকি খুবই পারদর্শী। আমার অন্তরে কৌতুক এবং কৌতূহল যুগপৎ জাগরিত হইল। আমি আগাইয়া তাহার সম্মুখে গেলাম।

টিপের চিন্তায় তিনি এতই তন্ময় ছিলেন যে আমাকে প্রথমে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করমর্দ্দন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন একটি কাগজে লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে আমিও একটি 'টিপ' চাই। মিস্টার জোনস্ উত্তরে লিখিলেন, 'ওয়েট এ বিট।' আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সকলে যখন চলিয়া গেল তখন মিস্টার জোনস একটি ঘোড়ার নাম লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই ঘোড়াটিতে তাঁহার নিজের খেলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। আমি যদি খেলি, সিওর লাক্। আমি একটি সিকি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিতে গেলাম, কিন্তু জিব কাটিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মনে হইল, ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে একটি চরিত্র যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়াছে। ডিকেন্সের প্রতি শ্রদ্ধা বশতই একখানা চেয়ার টানিয়া মিস্টার জোনসের পাশে বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা লিখিলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। সংক্ষেপে দরকারী কথাটুকু কেবল জানাইতেছি। মিস্টার জোনসের পরামর্শ অনুযায়ী দুইদিন রেস খেলিয়াছিলাম। পাঁচশত টাকা হারিয়াছি। আমাকে কিছু টাকা, অন্তত হাজারখানেক, টি. এম. ও. করিয়া অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি রেস খেলিয়াই ওই পাঁচশত টাকা উদ্ধার করিব। তোমার যাহা মনে হইতেছে এবং যাহা তুমি পত্রযোগে বলিবে তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। তোমার যাহা বক্তব্য তাহা তুমি বল আমি আপত্তি করিব না। তোমার পত্র যত দীর্ঘই হোক, আদ্যন্ত পড়িব—এ প্রতিশ্রুতিও দিতেছি, কিন্তু টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইবে। গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই আমি হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছিলাম, বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে একটা হাজার টাকার চেকও পাঠাইলাম

তোমার নামে। টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিও। আমি কলিকাতায় আর এক কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় টেরও পাইয়া গিয়াছ। একটা ছোট বাসা ভাড়া করিয়া লিলিকে সেইখানেই রাখিয়া আসিয়াছি। বোর্ডিং হাউসে বেচারার বড় কষ্ট হইতেছে দেখিলাম। একটা ঠাকুর এবং হোলটাইম ঝি-ও বাহাল করিয়া দিয়াছি। যখন তাহার ভারই লইতে হইল তখন ভদ্রভাবেই তাহা লওয়া উচিত। আমি এখান হইতে দেশে ফিরিব। মনু মাসীর কাছে দিনকতক থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। কাশীতে যাইতে পারি, মানে সেই জুয়েলারি দোকানের সম্পর্কে। আমার ভালবাসা জানিবে। আশা করি কুশলে আছ। ইতি

তোমারই—
নীলাম্বর।

১৪-৩-২৮

প্রিয় সদানন্দ,

সানন্দে সুসংবাদটি জানাইতেছি। এবার ভগবান মিস্টার জোন্সের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার শেষের টিপ তিনটি ফলপ্রদ হইয়াছে। যাহা হারিয়াছিলাম তাহা পুনরুদ্ধার করিয়াছি। উপরন্তু কিছু লাভও হইয়াছে। কিছু টাকা লিলিকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি আর তাহাকে টাকা দিও না। মাঝে মাঝে খবর লইও। আমি কাশী চলিলাম। ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমার—
নীলাম্বর।

মুঙ্গের
১৫-৪-২৮

ভাই সদানন্দ,

কাশী হইতে তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই। হীরা জহরতের ব্যাপারে এতই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল যে সময় ছিল না। এতদিন দোকানটি যে লোকের হাতে ছিল তাঁহার নাম অভয় মিত্র। কিন্তু এমন ভয়ানক ও শত্রুভাবাপন্ন লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। লোকটি একচক্ষু, কৃষ্ণকান্তি, মুখময় বসন্তের দাগ, মাথায় কদম ছাঁট চুল। অতিশয় স্বল্প-ভাষী। একটি মাত্র বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া বার বার নির্গত হইতে শুনিলাম, তাহা এই—"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই জানি না, আপনি যা করতে চান করুন।" মনু মাসী আমাকে যে সব জিনিসপত্রের লিস্ট দিয়াছিলেন গণনায় এবং আকৃতিতে সেগুলি ঠিকই আছে। কিন্তু পরীক্ষা করাইয়া দেখিলাম একটি পাথরও আসল নয়, সমস্তগুলিই নকল। অভয় মিত্র বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না।" দোকান চালাইবার জন্য মাসে তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, কিন্তু একটি ত্রিতল বাড়ী হাঁকাইয়াছেন দেখিলাম। মোট কথা, দোকানে একটি মাত্র খাঁটি রত্নই দেখিতে পাইলাম—সেটি শ্রীযুক্ত অভয় মিত্র। অগাধ সমুদ্র হইতে পুলিশ এ বস্তুটি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি-না জানি না। কিন্তু আইনত তাহারাই ডুবুরি, সুতরাং তাহাদের হস্তেই সমস্ত ব্যাপারটা সমর্পণ করিয়াছি। মনু মাসী বলিলেন, প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিস দোকানে ছিল। যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্য দুইশত টাকার অধিক নয়। মনু মাসীর নির্দেশ অনুসারে ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। মাল যদি উদ্ধার হয় আমিই তাহার উত্তরাধিকারী হইব মনু মাসী এই মর্ম্মে একটি উইলও করিয়াছেন। উপস্থিত

আমাকেই মোকদ্দমার খরচ চালাইতে হইবে, কারণ মনু মাসীর হাতে নগদ টাকা তেমন কিছু নাই। জমিজমা হইতেই সংসার চলে। একটা বিধবার কতই বা খরচ। মোট কথা, আমি এখন গহ্বরস্থ হইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া যাইব কি-না কে জানে। তুমি যদি কিছু বুদ্ধি দিতে পার দিও। এখানে আসিয়া লিলির একটি পত্র পাইলাম। অত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। দুই-একটা বানান ভুল আছে, "কৃতজ্ঞ" কথাটা ঠিক লিখিতে পারে নাই, অক্ষরগুলিও বড় বড়, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে এইটাই তো বড় কথা। তুমি তাহার নিকট অনেক দিন যাও নাই লিখিয়াছে। তোমার এ ঔদাসীন্য কি ইচ্ছাকৃত? লিলির সম্বন্ধে তুমি তোমার মতলবটা কোন দিনই খুলিয়া বল নাই। সম্মুখে গুঁই গাঁই কর, চিঠির মারফৎ মরাল লেকচার দাও। অথচ লিলির ব্যাপারে তোমার আমার দায়িত্ব সমানই হওয়া উচিত। আমরা উভয়েই তাহাকে গুণ্ডার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি না হয় তাহার আর্থিক দিকটার ভার লইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া নৈতিক দায়িত্বটা কি তুমি এড়াইতে পার? যদিও তোমার সহিত অনেক বিষয়ে আমার মতের অমিল আছে কিন্তু তুমিই যে আমার একমাত্র বন্ধু তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যান্য বহু বিষয়ে তোমার স্পষ্ট মতামত আমার জানা আছে এবং তদনুযায়ী আমি চলিয়া থাকি কিন্তু লিলির ব্যাপারটা তুমি ঠিক কি আলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মরাল লেকচারগুলি যে ভাঁওতামাত্র তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?

ভালবাসা লিও। আশা করি সুস্থ শরীরে আছ। ইতি

তোমারই—

নীলাম্বর।

মুঙ্গের
১৩-৫-২৮

ভাই সদানন্দ,

প্রায় একমাস পূর্ব্বে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার কোনও উত্তর এ পর্য্যন্ত পাইলাম না। লিলিরও কোনও পত্র আসে নাই। তাহাকে তাহার খরচের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। আমিও তোমাদের কোনও চিঠি লিখিতে পারি নাই, কারণ দারুণ গ্রীষ্মে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি। মনু মাসীর শরীরটাও ভাল নাই। পেটের অসুখে ক্রমাগত ভুগিতেছেন। এখানকার ডাক্তারেরা এখনও হাল ছাড়েন নাই। যদি ছাড়িয়া দেন তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় যাইব। লিলির কাছেই উঠিব। লিলির আলাদা বাসার কথা মনু মাসীকে বলিয়াছি। আশঙ্কা হইয়াছিল, মনু মাসী হয়তো রাগ করিবেন। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাকে আর কি বলব বাবা। বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, একটি কথা শুধু বলছি, দেখো মেয়েটির যেন কোনও অসম্মান না হয়। অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছ খুবই ভাল কথা, কিন্তু দেখো তার দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" তুমি আমাকে যে সব মরাল লেকচার দিয়াছিলে মনু মাসীর কথাগুলি তদপেক্ষা অনেক বেশি মর্ম্মস্পর্শী। মনে হইতেছে কথাগুলি তাঁহার মর্ম্ম হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার আর একটা কথা মনে হইল। স্কুল কলেজে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা আমাদের চরিত্রগত দোষ দুর্ব্বলতা কুসংস্কার স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে না, পুষ্ট করে। নিমগাছ সার পাইয়া পুষ্টতর নিম ফলই

ফলায়। সার না পাইলেও আমের গাছ যে ফল ফলাইবে তাহা আমই হইবে, নিম হইবে না। মনে হইল মনু মাসী সেই আম গাছ। আমরা চতুর্দ্দিকে সুপুষ্ট নিম গাছের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কিন্তু নিম।

হ্যাঁ, তোমাকে আর একটা সুসংবাদও দিবার আছে। কাশী হইতে পুলিশ সংবাদ দিয়াছেন যে হয়তো তাঁহারা লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে পারিবেন। অভয় মিত্র নাকি বামাল সমেত ধরা পড়িয়াছেন। অভয় মিত্রের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি পত্র ও রসিদ আবিষ্কার করিয়াছে। সেই পত্র ও রসিদগুলির সাহায্যে মীরাট, কলিকাতা ও বোম্বের কতকগুলি জহুরীরও সন্ধান মিলিয়াছে। পুলিশ আশা করিতেছে যে, তাহারা টাকা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া লইবে। আমার মন-মার্জ্জার উচ্চক্ষু হইয়া আছে যদি শিকাটা ছিঁড়িয়া পড়ে। ছিঁড়িবে কি? যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই আমি জুয়েলারি দোকান ফাঁদিব। ব্যবসায়ের পক্ষে কলিকাতাই সর্ব্বোত্তম স্থান। যাঁহারা ব্যাক টু ভিলেজের লেকচার দেন তাঁহারাও দেখি সকলেই কলিকাতাবাসী। অর্থ উপার্জন করিতে হইবে, খরচও করিতে হইবে, ইহার কোনটি বাদ পড়িলে আমাদের মতো লোকের জীবন ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। উভয় ব্যাপারের পক্ষেই কলিকাতা শহর প্রশস্ত স্থান। সাধু সন্ন্যাসীরা পর্ব্বতে গুহায় অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে গিয়া থাকুন, তাঁহাদের সে শক্তি আছে। যাঁহারা খুব ধনবান তাঁহারাও পর্ব্বতে গুহায়, অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে (মানে নিজেদের জমিদারীতে) গিয়া সুখে থাকিতে পারেন, কারণ অর্থের বিনিময়ে যে-কোনও প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য যে কোনও স্থানে মিলিতে পারে, সাহারা মরুভূমিতেও রেফ্রিজারেটার লইয়া গিয়া আইসক্রীম ভক্ষণ করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে কলিকাতাই ভাল। সুতরাং যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই যাইব। তুমি একটু নজর রাখিও

কোনও ভাল জায়গায় যদি দোকান করিবার মতো ঘর খালি থাকে। মনু মাসীকে লইয়া যদি কলিকাতা যাইতে হয় তোমাকে টেলিগ্রাম করিব। তুমি সত্যই শেষে চাকরির চেষ্টা করিতেছ না কি! এত লেখাপড়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কেরানীগিরি করিবে? অহো, দুর্ভাগ্য! তুমি তোমার গত পত্রে ইহার আভাস মাত্র দিয়াছিলে, তাহার পর আর কোনও খবর দাও নাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে তুমি ইতিমধ্যে হয়তো কোনও আফিসে ঢুকিয়া পড়িয়াছ এবং খবরটা আমার নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেছ। যদি ঢুকিয়াই থাক গোপন করিবার প্রয়োজন কি? শেষ পর্য্যন্ত গোপন থাকিবেও না। এবার কিন্তু পত্রোত্তর দিতে দেরী করিও না। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি ভাল আছ। লিলির খবর একটু লইও। ইতি—

নীলাম্বর

৮

মুঙ্গের
২৩-৫-২৮

ভাই সদানন্দ,

একটু আগে তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। মনু মাসীকে লইয়া আমি পরশু সকালে লুপ এক্স্‌প্রেসে কলিকাতা পৌঁছিব। তুমি স্টেশনে একটা ইনভ্যালিড চেয়ার বা ষ্ট্রেচারের বন্দোবস্ত রাখিও। লিলিকে বলিও দ্বিতলের বড় ঘরটি যেন পরিষ্কার করাইয়া রাখে, মনু মাসীকে সেই ঘরে রাখিব। যদি সম্ভব হয় একজন ভাল ডাক্তারের

সহিত পূর্ব্বেই এনগেজমেণ্ট করিয়া রাখিও। আমরা দশটা নাগাদ বাড়ীতে পৌঁছিব। তিনি যদি বারোটা নাগাদ আসিয়া পড়েন সেই-দিনই চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। লিলিকেও আমি আলাদা পত্র দিয়াছি, তবে সে আমার টানা হাতের লেখা পড়িতে পারিবে কিনা জানি না। তুমি যদি এই পত্র যথাসময়ে পাও, লিলির সহিত দেখা করিও। অভয় মিত্রের আর কোন খবর পাই নাই। অধিক আর কি। ভালবাসা লও। ইতি—

নীলাম্বর।

৯

মুঙ্গের
৪-৯-২৮

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা যে সদিচ্ছা প্রণোদিত সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার প্রকৃত হিতৈষী একথাও আমি জানি। কিন্তু আমাকে এতদিন দেখিয়াও কি তুমি আমাকে চেন নাই? আমি যাহা করিব ঠিক করিয়াছি তাহা করিবই। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা খুবই যুক্তি-যুক্ত। মনু মাসীর শ্রাদ্ধে কলিকাতায় যখন একবার কাঙালী ভোজন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে তখন মুঙ্গেরে আবার ও ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেখ, আমরা অহঙ্কারবশত একটা জিনিষ প্রায়ই ভুলিয়া যাই এবং আমরা নিজেদের নিক্তিতেই সকলকে ওজন করি। যিনি নিজে চরিত্রহীন তিনি সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, যিনি নিজে চরিত্রবান তিনি সকলকেই সাধু মনে করেন। যে দরিদ্র সে ভাবে মোটরের প্রয়োজন

কি? যিনি মোটর-বিহারী তিনি বলেন অনর্থক হাঁটিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? নিজের মোটর কিনিবার যদি সামর্থ্য না থাকে ট্রামে চড়। কিন্তু আমরা জানি আমাদের শ্যামদা হাঁটিতেই ভালবাসিতেন। শ্যামবাজার হইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যাইতেন অর্থাভাবে নয়, মনের আনন্দে। তুমি যেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছ আমার নিকট তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানকার দীন-দুঃখীদের খাওয়াইয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব। মনু মাসীর আত্মা যদি কোথাও বাঁচিয়া থাকেন তিনিও তৃপ্তিলাভ করিবেন। হাজার দুই তিন টাকা কি ইহার চেয়ে বেশী মূল্যবান? তা ছাড়া অতগুলি টাকা তো মনু মাসীর জন্যই পাইয়াছি একথা ভুলিয়া যাওয়া কি উচিত? তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া চেকটি ভাঙাইয়া যে সব জিনিষ আমি কিনিয়া পাঠাইতে বলিয়াছি—বিশেষ করিয়া ভীম নাগের সন্দেশ ও নবীন ময়রার রসগোল্লা—প্রচুর পরিমাণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। পাঁচশতের বেশী লোক হইবে না। পাঁচশত লোককে খাওয়াইতে (মানে, ভাল করিয়া খাওয়াইতে) যত লাগে ততই পাঠাইবে। আরও টাকার যদি প্রয়োজন মনে কর লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

আর একটি কথা, তুমি কলেজ স্ট্রীটের উপর সেই বাড়ীটি যেন হাতছাড়া করিও না। বৌবাজারে যদি তেমন সুবিধা মতন বাড়ী না পাওয়া যায় ওইখানেই দোকান খুলিব। আর একটা অপব্যয় করিব ঠিক করিয়াছি। অভয় মিত্রের যাহাতে জেল না হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমন একটা গুণী লোককে জেলে পুরিয়া বেরসিক অপবাদ লইতে চাই না। তাহার ছেলেকে আমি চিঠি লিখিয়াছি টাকা দিয়া যতটা সাহায্য করা সম্ভব আমি করিব। সে যেন ভাল উকিল নিযুক্ত করে।

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সন্দেহ করিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। তোমার অফিসের কাজ কেমন

চলিতেছে ? তোমাকে আমি যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা আর একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও। আমি দোকানের অর্দ্ধেক শেয়ার তোমাকে দিতে রাজি আছি তুমি যদি দোকানটির দেখা-শোনা কর। চাকরিতে যাহা পাইতেছ তদপেক্ষা বেশী পাইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখিও। ভালবাসা লও। আশাকরি ভাল আছ।

ইতি তোমারই—

নীলাম্বর

১০

মুঙ্গের

২১-১০-২৮

ভাই সদানন্দ,

তোমার প্রেরিত মিষ্টান্নগুলি যথাসময়ে ভালভাবে পৌঁছিয়াছিল। ভোজও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি কোনও পত্র লিখিতেছ না কেন ? ক্রমাগত তোমার পত্রের অপেক্ষা করিয়া শেষে নিজেই লিখিতে বসিলাম। বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মনে বিবিধ রকম জিলাপী পাক খাইতেছে এবং তুমি দার্শনিক হাসি হাসিতে হাসিতে ভাবিতেছ, "আমি আগেই জানিতাম এই রকম একটা কিছু ঘটিবেই।

সুতরাং তোমাকে সমস্ত কথা খুলিয়াই লিখিতেছি। তোমার নিকট আজ পর্য্যন্ত কিছুই গোপন করি নাই, ইহাও করিব না। মনু মাসীর মৃত্যুর মাস খানেক পরেই আমি লিলিকে বিবাহ করিয়াছি। বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিলে সত্য কথাটা আরও স্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, বাধ্যই হইয়াছি।

তোমার চরিত্রের যে অংশটুকু মরাল লেকচার দিবার জন্য সদা

সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া থাকে তাহার নিকট জবাবদিহি করিবার কোনও প্রয়োজন আমার দিক হইতে নাই। তবু আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি এই কারণে যে, যদি তাহা শুনিয়া সেই অংশটুকুর কোনও উপকার হয়, যদি তাহা অমানুষিক স্তর হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষের দৃষ্টিতে মানবসুলভ দুর্ব্বলতাগুলি বিচার করিবার মতো সহৃদয়তা লাভ করে।

একটা কথা ভুলিয়া যাইও না যে আমি স্বাভাবিক মানুষ। অমানুষ বা অতি-মানুষের মাপকাঠি দিয়া যদি আমার আচরণ মাপিতে যাও তোমার অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে এবং সে ভুলের জন্য দায়ী তুমি, আমি নই। পুরাণকারেরা দেবতাদেরও যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে মানবীয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরদেরও বারম্বার তপোভঙ্গ হয়। তোমার নৈতিক আদর্শ শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নয়, তাহা হাস্যকর, তাহা অসম্ভব, তাহা অস্বাভাবিক। সে আদর্শ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছে, জলকে লক্ষ্য করিয়া তাহা যদি বলিত তাহা হইলে এই রকম শুনাইত, "হে জল, তুমি গড়াইও না, তুমি যে পাত্রে থাকিবে সে পাত্রের আকার ধারণ করিও না, তোমার মধ্যে ভগবৎ প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন না প্রতিফলিত হয়। রৌদ্রে তুমি উত্তপ্ত হও কেন? বায়ু তোমাকে তরঙ্গাকুল করে কেন? তুমি স্থির, ধীর অচঞ্চল হও।" তোমাদের এই উপদেশ শুনিয়া জল বেচারা যদি জমিয়া বরফও হইয়া যায় তাহা হইলেও তোমরা খুশি হইবে না, কারণ বরফ অবস্থাতেও সে তোমাদের উপদেশ ষোল আনা মানিতে পারিবে না। তোমাদের উপদেশ কেহ ষোল আনা মানিতে পারে না বলিয়াই তোমাদেরও কেহ মানে না। কারণ তোমরা অকবি, তোমরা বেরসিক। প্লেটো তাঁহার কল্পরাজ্য হইতে কবিদের বাদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কল্প বাস্তব কোনও রাজ্য হইতেই কবিরা বাদ পড়েন নাই, বাদ পড়িয়া গিয়াছেন প্লেটো নিজে! পরীক্ষার্থীছাড়া প্লেটো কেহ

পড়ে না, অবশ্য দুই একজন বাতিকগ্রস্ত পণ্ডিত আছেন তাঁহারা সবই পড়েন। শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের চাহিদা কিন্তু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তাঁহারা চিরকাল মানব-মানবীর হৃদয়লোকে বিরাজ করিবেন, প্লেটোরা বিরাজ করিবেন শেলফে। কবিরা কখনও মানুষকে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া কোনও একটা বিশেষ নীতি বা ইজমের ছাঁচে পুরিতে চেষ্টা করেন না, কারণ তাঁহারা যে জীবন-রসিক। সন্ধ্যার মেঘে মেঘে বর্ণ-লীলা দেখিবার সময় তাঁহারা যেমন চিন্তা করেন না যে বর্ণগুলি কোন্ জাতের, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাদের পরিচয় কি, তেমনি প্রণয়-ব্যাপারেও তাঁহারা মাথা ঘামান না যে, উহা বৈধ না অবৈধ, বিশেষ একটি সমাজে বিশেষ নিয়মাবলীর মধ্যে উহা খাপ খাইবে কি না। তাঁহাদের কাছে সত্য-অসত্য শিব-অশিব সুন্দর-অসুন্দরের যে প্রভেদ তাহা কোনও বিশেষ সমাজের বিশেষ নীতির নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নয়। তাঁহারা তাহার নির্দ্দেশ পান বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য হইতেই। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অলঙ্কৃত মানব জীবনই তাঁহাদের দেবতা, তাঁহাদের নিয়ামক। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—একমাত্র কবিই একথা বলিতে পারেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশদের মতো তাই তাঁহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাক সিঁটকাইয়া বা নাকে কাপড় দিয়া পথ চলেন না। জীবন-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া জীবনকে তাঁহারা উপভোগ করেন। সমাজ বা সমাজের নিয়ম সীমাবদ্ধ, জীবন কিন্তু অনন্তসম্ভাবনাময়। কবিরা সমাজে বাস করেন বটে কিন্তু উপাসনা করেন জীবনের। আমি যদিও উল্লেখযোগ্য কোনও কাব্য রচনা করি নাই কিন্তু মনে-প্রাণে আমি কবি। তুমি অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছ (এখনও লেখ কি-না জানি না) কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া মনে হয় তুমি অকবি। অতিশয় বেরসিক লোক তুমি। কাটখোট্টা নও, কারণ কাটখোট্টাদেরও

একটা জীবনাবেগ আছে, তাহা রুদ্র রুক্ষ, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। তুমি মোমবাত্তির মতো। কেহ যদি তোমাকে দয়া করিয়া জ্বালিয়া দেয় আইনত যতটুকু জ্বলিবার ততটুকু জ্বলিয়া অবশেষে তুমি নিবিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র খদ্যোতেরও যে স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি আছে তোমার তাহা নাই। ময়ালিটির সঙ্কীর্ণ দাঁড়ে বসিয়া তুমি কতগুলি বাঁধা বুলি কপচাইতেছ মাত্র। সত্যই তোমার জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। ভাই সদানন্দ, এখনও সময় আছে, এখনও ত্রিশের কোঠায় বয়স আছে, এখনও ফিরিতে পার।

লিলির সহিত আমার যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মানসিক দুর্ব্বলতা বশতই ঘটিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমি বলিব, ওই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্যই মানব-জীবন সুন্দর, ওই দুর্ব্বলতাটুকু আমার মধ্যে ছিল বলিয়াই আমি লিলিকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

.... যেদিন ঘটনাটা ঘটিয়া গেল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত ঘটনাও ঘটিল। মনে হইল মনু মাসীর সেই কথাগুলি আবার যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "দেখো বাবা মেয়েটির যেন কোনও অসম্মান না হয়, দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" আমার কানের কাছে মনু মাসী নিজে যেন কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

.... সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। লিলিকে একটা কাগজে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না। লিলিও লিখিয়া উত্তর দিল, আপনার যাহা খুশি করুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। সেই মূক ও বধিরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিন্তু আমি আরও স্পষ্টতর উত্তর পাইলাম। তাহা ব্যর্থক নয়।

পরদিনই আমি আইনত রেজেষ্ট্রি করিয়া লিলিকে বিবাহ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল তোমাকেও এ বিবাহের সাক্ষী করি কিন্তু

তোমার মতিগতি দেখিয়া সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ বিবাহে সাক্ষী হইয়াছে মহেশ, চুনীর দাদা। তাহার সহিত দিল্লীতে দেখা হইয়াছিল, আবার কলিকাতাতেও দেখা হইয়া গেল। তাহারই সাহায্যে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন লিলিকে ঘৃণার বা কৃপার চক্ষে দেখিবার কোনও অজুহাতই তোমার থাকা উচিত নয়, কারণ আইনত সে এখন আমার বিবাহিতা পত্নী। লিলির আচরণে যাহা লক্ষ্য করিয়া তুমি সন্দিগ্ধচিত্তে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলে তাহা আশা করি এখন তোমাকে আনন্দিত করিবে। আমিই আমার পত্নীকে গহনা, কাপড় এবং প্রসাধন সামগ্রী কিনিয়া দিয়া আসিয়াছি। উহা তাহার নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ নয়।

দোকান ঘরটির সম্বন্ধে কি স্থির করিলে? মল্লিক মহাশয় বৌবাজারের যে ঘরটির কথা বলিয়াছিলেন সেটির সম্বন্ধে আর কিছু শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক তাহা হইলে কলেজ স্ট্রীটের ঘরটাই ভাড়া করিয়া ফেল। কলিকাতাতে গিয়াই নব-জীবন আরম্ভ করা যাক! আমার ইচ্ছা তুমি চাকরিটা ছাড়িয়া দাও, আমার দোকানের অংশীদার হও। টাকা-পয়সা কিছুই তোমাকে দিতে হইবে না, তুমি দোকানটি চালাইবে এবং বিনিময়ে অর্দ্ধেক লাভ পাইবে। রাজী হইয়া যাও। আমি এখানকার ব্যাপার মিটাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা যাইব। মনু মাসী এখানকার বাড়ীটাও আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। একজন খরিদ্দার জুটিয়াছে, বাড়িখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিব ঠিক করিয়াছি। হাজার কুড়ি টাকা ব্যাঙ্কে থাকিলে আমার ঢের বেশি সুবিধা হইবে, কি বল?

অবিলম্বে উত্তর দিও। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

পুনশ্চ। অভয় মিত্র ছাড়া পাইয়াছে।

১১

মুঙ্গের

১৭-১১-২৮

ভাই সদানন্দ,

তুমি যাহা লিখিয়াছ সাধারণ যে কোনও লোক তাহাতে দমিয়া যাইত কিন্তু আমি দমিবার পাত্র নই। কলিকাতায় আমাদের পরিচিত সমাজ যদি লিলিকে সম্মানের আসন দিতে সম্মত না হয় সে সমাজ আমি ত্যাগ করিব। প্রয়োজন হইলে কলিকাতাই ত্যাগ করিব। পৃথিবীতে কলিকাতা ছাড়াও আরও শহর আছে। কলিকাতা ত্যাগই করিতে হইবে। কারণ কোনও স্থানে পরিচিত ব্যক্তিদের উপহাস বা উপদেশের লক্ষ্যস্থল হইয়া বাস করা শক্ত। আমি হয়তো গা বাঁচাইয়া চলিতে পারিব, কিন্তু লিলি পারিবে না। লোকে বাড়ী বহিয়া আসিয়া তাহাকে অপমান করিয়া যাইবে। সুতরাং কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। মুঙ্গেরে হয়তো থাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। তা ছাড়া, এখানেও উপহাসদক্ষ উপদেষ্টার অভাব নাই। এমন স্থানে বাস করিতে হইবে যেখানে কেহ আমাদের চেনে না। তুমি সুভাষিণী নাম্নী যে মেয়েটি আমার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলে লিলিকে বিবাহ না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে আমি বিবাহ করিতাম। তুমি হয়তো মনে করিতেছ যে মেয়েটির রং কালো এবং তাহার বাবা গরীব বলিয়া আমি এড়াইয়া গেলাম। বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে আমি সচেষ্ট হইয়া কিছুই করি না। আমাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা ঘটিবার তাহা আপনিই ঘটিয়া যায়। কেন ঘটে, ঘটা উচিত কি-না—এসব লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি অপারগ। রূপ ক্ষণিকের এবং বংশ মর্য্যাদাই

যে নির্ভরযোগ্য জিনিস ইহা লইয়া তুমি অনেক কথা লিখিয়াছ। আমি একটি কথারও প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ প্রত্যেকটি কথা সত্য। কিন্তু সত্যকে পাইতে হইলে যে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথের পথিক হইতে হয় সে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথে আমি চলিতে শিখি নাই। রূপ ক্ষণিকের, ইহা জানিয়াও আমি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, বংশমর্য্যাদা নির্ভরযোগ্য জিনিস ইহা মানিয়াও সব সময় তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারি না। তোমাকে শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, লিলির সহিত জড়াইয়া না পড়িলে নিশ্চয় আমি তোমার মনোনীতা পাত্রী সুভাষিণীকেই বিবাহ করিতাম। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের দীনতা বাধাসৃষ্টি করিতে পারিত না, তাহাদের আর্থিক অসচ্ছলতাও আমাকে বিরত করিত না। তবে তাহাদের বংশমর্য্যদাই যে বিশেষভাবে আমাকে আকৃষ্ট করিত তাহাও নয়। তাহাকে বিবাহ করিতাম, তোমার অনুরোধে। যাক, এখন ওসব লইয়া আর মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

চাকরির স্বপক্ষে তুমি যে যুক্তিগুলি দিয়াছ তাহা বেশ ভালই লাগিল। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ। চাকরিতে একটি, বা, বড় জোর, দুইটি মনিবকে খুশি রাখিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। ব্যবসায়ীকে বহু লোকের মন রাখিতে হয়। চাকরিতে দশটা-পাঁচটা আফিস করিয়া বাকি সময়টুকুও যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। দোকান করিলে সব সময়ে দোকানে বসিয়া থাকিতে হইবে। ছুটিও নাই। ছুটি লইলে নিজেরই ক্ষতি। তুমি সাবধানী লোক, তোমার যুক্তিগুলি তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। খাঁচার পাখীরাও বোধহয় ওই ভাবেই চিন্তা করে। তা ছাড়া, এখন তো সবই গোলমাল হইয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আমি যে এখন কোথায় যাইব তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং জুয়েলারি দোকান করিয়া বড়লোক হইবার বাসনা আপাতত ত্যাগ করিলাম। তুমিও ত্যাগ কর। কোথাও একটা আস্তানা

ঠিক করিতে পারিলে লিলিকে গিয়া লইয়া আসিব। আপাতত সে যেমন আছে থাক। তোমার দূরদর্শিতা ও সাবধানতা, তোমার নৈতিক নিক্তি এবং সারবান যুক্তি, হয়তো তোমার নৌকাটিকে সর্ব্ববিধ ঝড়ঝাপটা হইতে বাঁচাইয়া একদিন কোনও নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, অদূরদর্শিতা অসাবধানতা যথেচ্ছ-নীতি এবং অসার যুক্তি জীবনকে যে বিচিত্র স্বাদ দান করে সে স্বাদ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার জীবন জ্যামিতির ছবির ন্যায় প্রাণহীন, কিন্তু আমার জীবন নদীর মতো বেগবান। তাহাতে হয় তো আবিলতা আছে কিন্তু তাহা জীবন্ত। তুমি বন্দরে পৌঁছিবে, আমি পৌঁছিব সাগরে।

আর হয় তো তোমার সহিত দেখা হইবে না। তবে যেখানেই থাকি মাঝে মাঝে চিঠি লিখিব। ভালবাসা লও। আশাকরি ভাল আছ। ইতি

তোমারই
নীলাম্বর

১২

পাটনা
৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ

বহুদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। লিলিকে লইয়া যেদিন কলিকাতা ত্যাগ করি সেদিন ইচ্ছা করিয়াই তোমার সহিত দেখা করিয়া আসি নাই। দেখা হইলেই তর্ক হইত এবং তর্ক তিক্ততার সৃষ্টি করিত। তুমিও মত বদলাইতে না, আমিও পথ বদলাইতাম না। নূতন করিয়া সংসার পাতিবার মুখে বন্ধুর সহিত কলহ করিবার

প্রবৃত্তি হইল না। আমি এখন কোথায় আছি জান? অভয় মিত্রের বাড়ীতে। পাটনা শহরেও মিত্র মহাশয় একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আমিই খরচপত্র করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে বাঁচাইয়াছিলাম। এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে নূতন নয়। পরোপকার করিবার জন্য নয়, খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকবার আমি এবম্বিধ কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু মিত্র মহাশয় যাহা করিলেন তাহা আরও অভিনব। তিনি বোধ হয় এ ধরণের কাজ জীবনে আর কখনও করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আমাকে কেন আপনি রক্ষা করলেন। আমি পাপী, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত।" একটা নূতন ধরনের মুশকিলে পড়িয়া আমি বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম! শেষে একটা কথা বলাতে ভদ্রলোক কতকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলাম, "দেখুন পদস্খলন সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। ফলে কোলকাতার বাস উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। মুঙ্গেরেও থাকা যাবে না।" অভয় মিত্র বলিলেন, "আমার পাটনার বাড়ীটা খালি পড়ে আছে, আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন না। ও তো আপনারই বাড়ি।"

তাহার পর হইতে মিত্র মহাশয়ের সহিত বেশ মাখামাখি হইয়াছে। লোকটিকে ক্রমশ ভাল লাগিতেছে। ফলে কাশীতেই পুনরায় জুয়েলারি দোকানটি স্থাপিত করিয়া ওই অভয় মিত্রকেই তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছি।

মোটামুটি এই আমার সংবাদ। তুমি আশা করি সুবোধ বালকের মতো কর্ত্তব্যপথে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতেছ। ইতি-মধ্যে কোন বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছ কি? হ্যাঁ, তোমাকে আর একটি সুসংবাদ দিতেছি। তোমার কাছে ইহা দুঃসংবাদ বলিয়া মনে হইবে কি না জানি না। আমার একটি মেয়ে হইয়াছে। লিলি তাহার

নাম রাখিয়াছে হাসি। লিলি এখনও কথা বলিতে পারে না। লিখিয়াই আমাদের কথাবার্ত্তা হয়। বেশ একটা নূতন ধরনের দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতেছি। আশা করি কুশল সব। তোমার বাবা কেমন আছেন? আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই নীলাম্বর

১৭

পাটনা

১১-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার কথা যে প্রায়ই তোমার মনে হয় এই সংবাদে সত্যই বলিতেছি আমার মনের একটি নীরব তন্ত্রী যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তুমিও বিবাহ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার ঠিকানা জানা থাকিলে আমাকে যে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে এ কথা তোমার লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমি তাহা জানি। কিন্তু তুমি নিমন্ত্রণ করিলেও আমি যাইতাম না। আমি সামাজিক জীব নই, সমাজের কোথাও আমি ঠিক খাপ খাই না, সেই জন্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া থাকি। আমার মতো লোকের হোটেলে বাস করাই উচিত। যদিও বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার যোগ্যতা আমার নাই। লিলির সম্বন্ধে তুমি যেসব প্রশ্ন করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। লিলিকে আমি ভালবাসি কি না, তাহাও ঠিক জানি না। কারণ রোমান্টিক ভালবাসার স্বাদই আমি কখনও পাই নাই। কাব্যে তাহার যে সব লক্ষণ পড়িয়াছি তাহার সহিত আমার মনের অবস্থা একটুও

মেলে না। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, লিলিকে খারাপ লাগে না খুব। ও যদি কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে হয়তো আর একটু ভাল লাগিত। অনেক দিন আগে আমি জিমি নামে একটি কুকুর পুষিয়াছিলাম। মনে আছে তোমার? জিমির সম্বন্ধেও আমার ঠিক এই কথাই মনে হইত। ভাবিতাম, আহা, জিমি যদি কথা বলিতে পারিত, কি চমৎকারই না হইত! লিলির সহিত জিমির তুলনা করিলাম ইহাতে হয়তো তুমি চটিবে। কিন্তু সত্য বলিতেছি, লিলিকে দেখিয়া আমার জিমির কথা মনে পড়ে। জিমি যেমন আমাকে ভালবাসিত লিলিও তেমনি ভালবাসে। কিন্তু তাহা রোমান্টিক প্রণয় নয়, আদর্শ পতিভক্তিও নয়, তাহা কেমন যেন একটা অন্ধ কৃতজ্ঞতা। লিলিকে তাহার অতীত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিতে চায় না। একদিন শুধু লিখিয়াছিল—'যাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে চাই তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এ অনুরোধ আমাকে করিও না।' আমিও আর অনুরোধ করি নাই। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি। লিলি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উঠিয়া দেখিলাম কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিল। তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলাম ক্রন্দনের হেতুটা কি, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিল না। তাহার হাঁটুটা ফুলিয়াছে, হয়তো তাহারই যন্ত্রণায় কাঁদিতেছিল। একজন ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইয়াছি! লিলি ডাক্তারকে হাঁটু দেখাইতেও আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি আমি শুনি নাই। লিলির সম্পর্কে একটা জিনিস আমাকে বড়ই বিব্রত করিতেছে। সে আমাকে অত্যন্ত বেশি সমীহ করিয়া চলে। তাহার কুণ্ঠা আমি কিছুতেই ঘুচাইতে পারি না। সর্ব্বদা সে যেন কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া আছে। মনে হয়, আমাকে ও ভয় করে। সুতরাং সে আমার গৃহিণী, সচিব বা সখী কোনটাই হইতে পারে নাই।

তবে একটা জিনিস সে হইতে পারিয়াছে—জননী। হাসিকে লইয়া তাহার অধিকাংশ সময় কাটে, আমাকে লইয়া নয়। হাসি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। চোখ দুইটি তো অবিকল মায়ের মতো। তুমি লিখিয়াছ, তোমার বউ গহনা-কাপড় সমন্বিতা জীবন্তা 'ডামি' বিশেষ। ওই 'ডামি' যখন mummy হইবে তখন দেখিবে তাহার আলাদা রূপ খুলিয়াছে! লিলির মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি! ম্যাডোনার সেই ছবিটা মনে পড়িয়া যায়! কিন্তু আড়ালে ছবিটা দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমাকে দেখিলেই লিলি কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে! কেন বল দেখি? তোমার ভগিনীটি বিধবা হইয়া তোমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে লিখিয়াছ। ভাগিনেয়ীটি কি বিবাহযোগ্য? ভাগিনেয়টি কত বড়? কোন্ ক্লাসে পড়ে? তোমার আয় পরিমিত, ব্যয়ের মাত্রা যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায় মুশকিলে তো পড়িবেই। আমি তোমাকে এই সঙ্গে হাজার টাকার একটি চেক্ পাঠাইলাম। দিবার সঙ্গতি আছে বলিয়াই পাঠাইতেছি। ইহা লওয়া না লওয়া তোমার ইচ্ছাধীন। সুদীর্ঘ মরাল লেক্‌চার দিয়া যদি ইহা ফেরত দাও বিস্মিত হইব না। শুধু অনিবার্য্য ভাবে একটি কথা মনে হইবে—আমি তোমার পর হইয়া গিয়াছি। আশা করি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। ইতি

তোমারই—
নীলাম্বর

১৪

পাটনা

১৯-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

আমার এই পত্র পাইয়া তুমি হয়তো আবার একটি দার্শনিক হাসি হাসিবার সুযোগ পাইবে। মনে মনে হয়তো বলিবেও, অজ্ঞাত কুলশীলাকে বিবাহ করিবার ফল এইবার ফলিতেছে। লিলির হাঁটু ফুলিয়াছিল এ সংবাদ তোমাকে পূর্ব্বেই দিয়াছি। সাধারণ ঔষধে ব্যাধির উপশম না হওয়াতে ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন আসিয়া খবর দিলেন যে রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমারও রক্ত লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার রক্তে কিছু পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারবাবুর সন্দেহ, লিলির পিতৃ বা মাতৃকুল হইতে হয়তো রক্তে এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে। ব্যাপারটা জটিল ঠেকিতেছে। তোমাকে এসব সংবাদ জানাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কেবল বন্ধু হিসাবে তোমাকে আনন্দের কিছু উপকরণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই এসব লিখিতেছি। আশা করিতেছি, সংবাদটা পাইয়া তুমি বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। বহুকাল পূর্ব্বে একজন ডাক্তার-বন্ধুকে এই জাতীয় আনন্দে উল্লসিত হইতে দেখিয়াছিলাম। আমরা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম এমন সময়ে একটি মৃত্যুসংবাদ আসিল। ডাক্তারবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"মারা গেছে! সত্যি? আমার ডায়গনোসিস ঠিক হয়েছে তা হলে! রমেশ ডাক্তার বলেছিল বেঁচে যাবে। মারা গেছে? সত্যি বলছ?" তোমার ডায়াগনোসিসও ঠিক হইয়াছে। স্নায়ত

তুমি আনন্দ করিতে পার। তবে আনন্দের আতিশয্যে একথা যেন মনে করিও না যে, আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে অনুতাপ করিতেছি। জীবনটা আমার নিকট খেলা মাত্র! একটানা একটা খেলাও নয়, বহু খেলার সমষ্টি। ক্রিকেট খেলায় অনেকবার আউট হইয়াছি, অনেকবার আউট করিয়াছিও। কোন্‌টা কত বার করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই, সব মনেও নাই। লিলির ব্যাপারটাও অনুরূপ একটা খেলা মাত্র। তুমি বিশ্বাস করিবে কি-না জানি না, কিন্তু ভারী মজা লাগিতেছে। মনে হইতেছে যেন অদৃশ্য কোনও "বোলার" আমাকে আউট করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে এবং আমি ক্রমাগত তাহাকে ঠেকাইয়া চলিয়াছি। "রান"ও করিয়াছি মন্দ নয়। তোমার মতো হিসাবী হইলে হয়তো সংখ্যাও বলিয়া দিতে পারিতাম।

ডাক্তারবাবু আগামী কল্য হইতে লিলির চিকিৎসা শুরু করিবেন। তিনি বলিলেন, ভবিষ্যতে হাসিরও রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে, আপাতত ভয়ের কোনও কারণ নাই।

আমার শরীর ভাল আছে। অভয় মিত্র এবার সার্থকনামা হইয়া উঠিতেছেন মনে হইতেছে। দোকানে বেশ লাভ হইতেছে। বেশ একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠাইয়াছেন।

তুমি কেমন আছ? তোমার মতো হিসাবী লোক খারাপ থাকিতে পারে না তোমার সম্বন্ধে এ ধারণা আমার নাই। কারণ তোমরা তোমাদের হিসাবের খাতা হইতে এমন অনেক জিনিস বাদ দাও যাহা আকস্মিক ধূমকেতুর মতো আসিয়া সমস্ত হিসাব ওলট পালট করিয়া দিতে পারে। সুতরাং জানাইও কেমন আছ। ভালবাসা লও। ইতি

তোমারই
নালাম্বর

১৫

পাটনা

২৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

এবার সত্যই 'আউট' হইয়া গিয়াছি, আনন্দে হাততালি দিতে পার। লিলি পরশু হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া দেখি হাসি বিছানায় একা শুইয়া ঘুমাইতেছে, লিলি কাছে নাই। এঘর ওঘর ঘুরিয়া দেখিলাম কোথাও নাই। ভাবিলাম হয়তো বাথরুমে গিয়া থাকিবে। ছোঁড়া চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। সে বলিল একজন কাবুলিওলার সহিত মাঈজী বাহিরে গিয়াছেন। সে আরও বলিল, কাবুলিওলাকে দেখিয়া মাঈজী কেমন যেন অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার বেশি সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। আমি অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পরে হঠাৎ লিলির চিঠিটা দেখিতে পাইলাম। সে বড় বড় অক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছে তাহা এই। 'ট্রু কপি' পাঠাইতেছি।

শ্রীচরণেষু,

আমি চলিলাম। জীবনে আর কখনও দেখা হইবে না। আমি একটা কথা তোমার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, বাধ্য হইয়াই করিয়াছিলাম। আমি যে বিবাহিতা সেকথা তোমাকে বলি নাই। আমার ধারণা ছিল আমার স্বামীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, কারণ একটি সাহেবকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। আমার স্বামীর ভাই একটি দুরাত্মা। সে আমাকে বিক্রয় করিবার জন্য কুম্ভমেলায় লইয়া আসিয়াছিল। সেই সময় আমি কয়েকটি গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি। তুমি ও সদানন্দবাবু আমাকে গুণ্ডাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া

আনিয়াছিলে। তাহার পর হইতে সমস্ত ঘটনা তুমি জান। আমার স্বামী অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পাইয়া গিয়াছেন এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এখানে আমার সন্ধান পাইলেন তাহা জানি না। তিনি কেবল বলিলেন গত ছয় মাস হইতে তিনি আমাকে প্রতি শহরে শহরে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আমার সহিত যে তোমার বিবাহ হইয়াছে একথা তাঁহাকে বলি নাই। আমি তোমার নিকট তোমার স্ত্রীর চাকরানী হইয়া আছি এই কথাই তাঁহাকে বলিয়াছি। তোমার নিকট যেমন ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছিলাম, রহমনের নিকটও তেমনি ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছি। আমরা অসহায়, আমরা ভীতু, সত্যপথে চলিবার সাহস আমাদের নাই। আমাকে ক্ষমা করিও। রহমন যদি তোমার কাছে কখনও আসে আমাকে রক্ষা করিও। সে বড় বদমেজাজী লোক, হয়তো আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে। হাসিকে ছাড়িয়া যাইতে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব উপায় নাই। ইতি—

লিলি

চিঠিখানি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চমক ভাঙিল হাসির কান্নায়! উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, দমিলে চলিবে না। তৎক্ষণাৎ দুধ ও ফিডিং বট্‌ল্ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলাম। কিছুতেই ফিডিং বটল্ ধরিতে চায় না, মহা মুশকিলে পড়িয়াছি। কি করি বল তো? মনে করিতেছি কাল হইতে একটি ওয়েট নার্স নিযুক্ত করিব। কিন্তু 'ওয়েট' মানেই পিছল! আবার না পা হড়কাইয়া যায়!

হ্যাঁ, কাল সকালে রহমন আসিয়াছিল। বেশ বলিষ্ঠ কাবুলী একটি। আসিয়া কি বলিল জান? বলিল তাহার বিবির তিন

মাসের মাহিনা বাকী আছে, পাওনাটা আমি মিটাইয়া দিলে সে দেশে চলিয়া যাইতে পারে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তাহাকে একশত টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া দিলাম। বলিলাম, উহার মধ্যে বকশিশও আছে। রহমান সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমি এখন কি করি বল তো ? একটু পরেই ডাক্তার ইনজেক্সন দিতে আসিবে তাহাকেই বা কি বলিব ? তা ছাড়া, চাকর-চাকরানীর কাছেই বা মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব কিরূপে ? এ ধরনের মানসম্ভ্রমের যদিও বিশেষ কোনও মূল্য নাই কিন্তু চলতি নোটের মতো এগুলির বাজার-দর আছে, পকেটে না থাকিলে জীবনযাত্রাই অচল হইয়া যায়।

যদি বেগতিক বুঝি, হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া আসিব। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে একবার কাশীও যাইতে হইবে। ভাবিতেছি কলিকাতা হইয়া হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া কাশী যাইব। তোমার ইহাতে যদি আপত্তি থাকে অবিলম্বে জানাইবে। তোমার নিকট হইতে নিষেধাত্মক কোন পত্র বা টেলিগ্রাম না আসিলে আমি হাসিকে লইয়া রওনা হইয়া যাইব। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। ইতি

তোমারই
নীলাম্বর

১৬

কাশীধাম
৩০-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের বাসায় বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতেছি। একটা অদ্ভুত প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

হাসির জন্য মন কেমন করিতেছে। যদিও জানি তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার মা, তোমার বোন, তোমার ভাগনি সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে হাসির যে যত্ন করিবে তাহা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তবু অস্থির হইতেছি। যদিও তাহাকে কোলে লইতে গিয়া প্রতিবারই একটা না একটা বিপদ হইয়াছে, তবু কি আশ্চর্য্য, তাহাকে বার বার কোলে লইতে ইচ্ছা করিতেছে। হাসির ভার তোমার উপরে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে কাশীবাস করিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি বাবা বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি আজই হয়তো কলিকাতা রওনা হইয়া যাইতাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের অনুরোধে আমাকে আরও দিন তিনেক এখানে অবস্থান করিতে হইবে। তিন দিন পরে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ! সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে মন সরিতেছে না। ৪ঠা জানুয়ারী আমি এখান হইতে রওনা হইয়া ৫ই সকালে কলিকাতা পৌঁছিব। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যে কি করিব তাহা অবশ্য ঠিক করিতে পারি নাই। একটা জিনিস কেবল বুঝিতে পারিতেছি—হাসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তাহাকে আমার নিজের কাছেই রাখিতে হইবে। শুধু যে আমার মন কেমন করার জন্যই কথাটা বলিতেছি তাহা নয়, ইহার একটা অন্য দিকও আছে। হাসি যদি তোমার বাড়ীতে মানুষ হয়, ভবিষ্যতে তাহার একটা মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া আমি ভীত হইতেছি। একটু জ্ঞান হইলেই সে বুঝিতে পারিবে যে সে পরের ঘরে মানুষ হইতেছে। তোমরা যে তাহার রক্ত-সম্পর্কিত নও একথাও ক্রমশ তাহার নিকট প্রকট হইয়া পড়িবে। স্বভাবতই তাহার মনে তখন প্রশ্ন জাগিবে, আমার বাবা এমন করিয়া আমাকে বন্ধুর বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? আমার মা কোথা? এই দুইটি প্রশ্নের যে উত্তর সে পাইবে তাহা ঠিক মতো তাহার মনের সঙ্গে খাপ খাইবে কি না তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর

করিতেছে। সত্য উত্তর অথবা মিথ্যা উত্তর কোন্‌টা যে এক্ষেত্রে খাটিবে তাহা বলাও শক্ত। তবে একটা জিনিস আমি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার মায়ের সত্য পরিচয় তাহাকে আমি দিব না। আমার বিশ্বাস, এ পরিচয় জানিলে তাহার চরিত্র সুস্থভাবে বিকশিত হইবে না। নিজেকে সে সর্ব্বদাই হেয় মনে করিবে। এ অপমান হইতে যেমন করিয়া পারি তাহাকে আমি রক্ষা করিব। আমার নিজের খেয়াল বা বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহার সু বা কুফল আমিই বহন করিব। হাসির গায়ে তাহার আঁচটি পর্য্যন্ত লাগিতে দিব না। আমার এই প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হইবে হাসিকে তোমাদের বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করা। শুধু তোমাদের বাড়ী হইতে নয়, আমার পরিচিত সমাজ হইতেই তাহাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিতে হইবে। লিলির কাহিনী এক তুমি ছাড়া আর কেহ জানে না। তোমার বাবাও বোধ হয় ঠিক মতো জানেন না। তুমি তোমার স্ত্রীকে একথা বলিয়াছ কি? যদি বলিয়া থাক তাহা হইলে আরও অধিক লোকের জানিবার সম্ভাবনা। মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া কাহিনীটা যে শেষ পর্য্যন্ত কি আকৃতি ধারণ করিবে তাহা তো কল্পনাতীত। সেই পল্লবিত কাহিনী যদি হাসির কর্ণগোচর হয় তাহা হইলে যাহা হইবে .... আর ভাবিতে পারিতেছি না। হাসিকে স্থানান্তরিত করিতেই হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে তুমি একটু ভাবিয়া রাখিও, এ সব বিষয়ে তোমার মাথা খেলে ভাল। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিব। ভালবাসা জানিবে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি

তোমারই
নীলাম্বর

১৭

৭-১-৩০

কাশীধাম

ভাই সদানন্দ,

হাসিকে ছাড়িয়া আসিতে খুবই কষ্ট হইয়াছে। তাহার কচি মুখ কচি কচি হাত-পা আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। অভয় মিত্রের টেলিগ্রাম না পাইলে হয়তো আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিতাম। তিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনখানি বাড়ীর সন্ধান করিয়া ফেলিবেন তাহা আশা করিতে পারি নাই। ভদ্রলোক একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিৎকর্ম্মা। আমি কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি একটি বাড়ী কিনিতে চাই, একটু খোঁজ রাখিবেন। তিনি যে এত শীঘ্র তিনটি বাড়ীর খবর লইয়া আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া বসিবেন তাহা কে জানিত। যে কারণে তিনি জরুরি তার করিয়াছিলেন সে কারণটি অবশ্য খুবই সঙ্গত। একটি বাড়ীর সম্বন্ধে অবিলম্বে কথা পাকা করিয়া না ফেলিলে সেটি হাতছাড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। আর একটি খরিদ্দার নাকি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। বাড়ীটি কিনিয়া ফেলিয়াছি। শহর হইতে একটু দূরে .... বেশ অনেকখানি হাতা-সুদ্ধ বাড়ী। দশ হাজার টাকায় ঠকা হয় নাই। বাড়ীটি আসবাবপত্র দিয়া সাজাইতে আরও হাজার দুই টাকা ব্যয় হইবে। অভয় মিত্র সে সম্বন্ধেও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

সুভাষিণী সম্পর্কে তুমি যে প্রস্তাবটি করিয়াছ তাহা নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলাম। হাসিকে যদি নিজের কাছে রাখিতে চাই তাহা হইলে বাড়ীতে দ্বিতীয় আর একটি স্ত্রীলোক না থাকিলে যে চলিবে না সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। আমার দূর সম্পর্কের যে দুই-

একটি বিধবা আত্মীয়া আছেন তাঁহাদের আহ্বান করিলে তাঁহারা এখনই হয়তো আসিয়া হাজির হইবেন। কিন্তু তাঁহারা নিষ্ঠাবতী বিধবা, হাসির জন্ম-রহস্য তাঁহাদের নিকট গোপন রাখিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মচ্যুতি করিতে মন সরিতেছে না। ইহাতে যে ধর্ম্মচ্যুতি ঘটে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা মনে করি না, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা মনে করেন তখন একথা তাঁহাদের নিকট হইতে গোপন করা অন্যায় হইবে মনে করি। সব কথা খুলিয়া বলিলে আরও অন্যায় হইবে, কারণ, কালক্রমে হাসি তাহা জানিতে পারিবেই। হাসি তাহার জন্ম-রহস্য জানুক ইহা আমি কিছুতেই চাই না। তা ছাড়া, হাসির সত্য পরিচয় পাইলে উক্ত বিধবারা হয়তো কিছুতেই আসিতে সম্মত হইবেন না, এমন কি জোর করিলে যে মাসোহারা আমি তাঁহাদের দিয়া থাকি তাহাও হয়তো তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিতে পারেন এ সম্ভাবনাও আছে। তৃতীয় অসুবিধা একটা বিধবাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার নানা হাঙ্গামাও আছে। সমস্ত বাড়ী জুড়িয়া একটা নিরামিষ আবহাওয়া গজাইয়া উঠিবে। তাহা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং ও চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওয়েট নার্স বা দাই রাখাও নিরাপদ নয়, বিবাহ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। সুভাষিণীকে বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু—হাঁ, মস্ত বড় একটা "কিন্তু" আছে। সুভাষিণী দেখিতে ভাল নয়, তাহার বাবা অতি দরিদ্র, একটিমাত্র কন্যারও বিবাহ দিতে তিনি অপারগ—অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা তুমি বলিয়াছ সে সব কিন্তু আমার আপত্তির কারণ নয়। সুভাষিণী স্ত্রীলোক বলিয়াই আমি ভীত হইতেছি। সে কি হাসির নিকট হইতে সত্য কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে? লিলির মতো সুভাষিণীও যদি বোবা হইত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। লেখাপড়া যখন কিছুই শেখে নাই তখন লিখিয়াও কিছু জানাইতে পারিত না। মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিকর অঙ্গ তাহাদের রসনা। কাউণ্ট অব মন্টিক্রিস্টো তাঁহার পুরুষ চাকরেরও

জিব কাটাইয়া লইয়া তবে তাহাকে বাহাল করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার তো তাহার উপায় নাই, বিবাহ করিতে হইলে স-রসনা কোনও নারীকেই বিবাহ করিতে হইবে! সুতরাং কি করিব এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। আমার দিক হইতে বিচার করিলে সুভাষিণীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী, কারণ তাহার এক বাবা ছাড়া তিনকুলে আর কেহ নাই। সুভাষিণী এবং সুভাষিণীর বাবা যদি সত্য কথাটা গোপন করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আমার ভাবনার বিশেষ কোনও কারণ থাকিবে না। সুভাষিণীর বাবা পুরুষ তাঁহার কথার উপর তবু আস্থা স্থাপন করিতে পারি কিন্তু সুভাষিণী স্ত্রীলোক তাহাকে কি বিশ্বাস করা চলিবে? বৃদ্ধ চাণক্য অভিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি অগ্রাহ্য করা উচিত? বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছি ভাই, চিন্তা করিয়া কোনও কূলকিনারা পাইতেছি না। তুমিও আমার হইয়া একটু চিন্তা করিও। আমি এখানকার কাজ সারিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আবার তোমার কাছে যাইতেছি। আমার ভালবাসা লিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি

তোমারই

নীলাম্বর

১৮

১৭-১-৩০

কাশীধাম

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে চিন্তাশীল লোক তাহা তোমার পত্র পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে হাসির জীবনে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন হয় সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে কিম্বা

একটি ভদ্রসন্তানের উপর অবিচার করিতে হইবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যে একদিন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিবে, তাহার জন্য যে বর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে একথা আমার মনেই হয় নাই। তোমার সঙ্গে আমার এইখানেই মূলত প্রভেদ। তুমি দূরদর্শী লোক। তোমার পত্র পাইয়া আমি ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ভাবিয়া দেখিলাম। সুদূর ভবিষ্যতে হাসির শ্বশুর বাড়ির লোকদের কি বলিব তাহা এখন হইতেই ঠিক করিয়া রাখা উচিত বই কি। হাসিকে যদি ভালভাবে মানুষ করিতে পারি, সত্যই যদি সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কর্ম্মে আচরণে ভদ্রঘরের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার সত্য পরিচয় গোপনই রাখিব। কারণ তাহার সত্য পরিচয় জানিয়াও তাহাকে ঘরে স্থান দিবে এরূপ আধুনিক মনোভাবাপন্ন ভদ্র গৃহস্থ আমাদের দেশে বিরল। আমাদের দেশে বিরল বলিয়াই যে হাসিকে জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে ইহাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। বরপক্ষীয়দের সহিত প্রতারণাই করিতে হইবে। প্রতারণা করিয়া কাহাকেও ক্ষতি-গ্রস্ত করাই অন্যায়। হাসিকে যদি সত্যই বরবর্ণিনী করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে যিনি লাভ করিবেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, লাভবানই হইবেন। আর হাসি যদি মানুষ না হয় তাহা হইলে আমি সচেষ্ট হইয়া তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিব না। সে নিজে যাচিয়া যদি কাহারও সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায় তাহাতেও আপত্তি করিব না। সেক্ষেত্রে প্রতারণার প্রশ্নও উঠিবে না। এই দ্বিবিধ সম্ভাবনার কথা মনে রাখিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া মানেই যে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা এই দুরতিক্রমনীয় যুক্তি আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমি যে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি তাহা মনে করিও না, সুভাষিণীর সম্বন্ধেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ভয় হইতেছে তোমার সুভাষিণীর রসনা নামক যন্ত্রটি আছে বলিয়া। তাহাকে বিবাহ করিলে সে

যে নিশ্চয়ই হাসিকে একদিন সব কথা বলিয়া ফেলিবে এ আশঙ্কা আমার কিছুতেই দূর হইতেছে না। সে যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল লইয়া শপথ করে তাহা হইলেও হইবে না।

মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমি আমার হইয়া আর একটু ভাল করিয়া চিন্তা কর ভাই। কলেজ-জীবনে গণিতশাস্ত্রে তুমি পারদর্শী ছিলে, আমার অনেক অঙ্ক কসিয়া দিয়াছ, এ অঙ্কটাও কসিয়া দাও। আমার সঙ্কোচটা যে কোথায় তাহা তোমাকে অকপটে বলিয়াছি, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা রাস্তা আমাকে বলিয়া দাও।

অভয় মিত্র আমার বাড়ীর আসবাবপত্র সব কিনিয়া ফেলিয়াছেন। গৃহ-প্রবেশের কয়েকটি শুভদিনও দেখিয়া রাখিয়াছেন। আমি কিন্তু ভাই, মোটেই উৎসাহ পাইতেছি না। আশা করি ভাল আছ। বউ কেমন লাগিতেছে? প্রথম প্রথম কাহারও খারাপ লাগে না, আশা করি তোমারও লাগিতেছে না। ভালবাসা জানিবে এবং অবিলম্বে উত্তর দিবে। ইতি

তোমারই
নীলাম্বর

১৯

২৮-১-৩০
কাশীধাম

ভাই সদানন্দ,

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হইতাম না। আমাদের দেশ যে এত অধঃপতিত হইয়াছে, নারীদের আত্মসম্মান যে এমন ভাবে ভূলুণ্ঠিত তাহা সত্যই আমার ধারণা ছিল না। তোমারও

ভাই একটু দোষ আছে! আমার চিঠিখানি তোমার সাবধান করিয়া রাখা উচিত ছিল, কারণ ওই চিঠিতে আমি যেসব কথা লিখিয়াছিলাম তাহা কেবল তোমারই জন্য, অপর কাহাকেও আমি ওসকল কথা অমনভাবে লিখিতাম না। অবশ্য একথা তোমার পক্ষেও আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল যে আমার ওই চিঠি পড়িয়া সুভাষিণী ক্ষুর দিয়া নিজের জিভটা কাটিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে মেয়েদের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে বল তো! তাহারা যে কোনও মূল্যে নিজেদের পুরুষদের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। লিলি এবং সুভাষিণী একই অবস্থার দুই রূপ। আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, বেশি কিছু লিখিতে পারিতেছি না। আজ তোমার নামে টি, এম, ও, করিয়া আমি পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়াছি। সুভাষিণীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা যেন হয়। প্রয়োজন হইলে আরও টাকা পাঠাইব, আর একথা লেখাই বাহুল্য যে সুভাষিণী যদি বাঁচে তাহাকেই আমি বিবাহ করিব। সে যেদিন হাঁসপাতাল হইতে ছাড়া পাইবে সেই দিনই করিব, অবশ্য ইহাতে তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। কারণ পঞ্জিকায় ঠিক সেই দিনটিতে বিবাহের শুভলগ্ন না-ও থাকিতে পারে। যেদিনই হোক, তাহাকে বিবাহ করিব। আপত্তি করিবার আমার আর পথ নাই। অবিলম্বে জানাইবে সুভাষিণী কেমন আছে। সম্ভব হইলে একটা টেলিগ্রাম করিও। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমার নীলাম্বর

অসিতের পত্রাবলী

১

লক্ষ্ণৌ

৬-৭-৪৯

ভাই মহেন্দ্র,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সদানন্দ বাবুর চিঠিগুলিও পড়লাম। চিঠিগুলি প্যাক করে আমার শ্বশুর মশায়ের নামে পাঠিয়ে দিয়েছি। হাসির কোনও চিঠি পাইনি। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তার উপর সামনেই পরীক্ষা। কি যে হবে জানি না। তুমি একটু খোঁজ কোরো। বিজয়বাবু নামে যে ছেলেটি ফিলসফি পড়াত তার খবর কি? বিজয়বাবু লতিকার ভাই, তোমাদের পাড়াতেই তার বাড়ি। তোমাকে একথা লিখতে সঙ্কোচ হচ্ছে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। কিন্তু আমি বিজ্ঞানেব ছাত্র, সত্য যদি কঠোরও হয়, তাকে মানতে হবে, চিনতে হবে। স্বল্প পরিচয়ে যে হাসিকে যতটুকু আমি চিনেছিলাম সে আমার কল্পলোকের অমরাবতীতে অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু যে হাসিকে আমি চিনি না তার পরিচয় জানবার কৌতূহলও হচ্ছে। তুমি যদি একটু আলোকপাত করতে পার উপকৃত হব। যদি কিছু জেনে থাক জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমি আমার বাড়িতে এখনও কিছু জানাইনি। কি যে জানাব জানি না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি। বিজয়বাবুর সব খবর চিত্রা অনায়াসেই যোগাড় করতে পারবে। খবরটা অবিলম্বে আমাকে জানিও। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলো পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। অবাক হবার অনেক উপকরণ আছে ওগুলোর মধ্যে, কিন্তু আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি আমার শ্বশুর মশায়ের সত্য পরিচয় পেয়ে। তাঁর সম্বন্ধে এতদিন আমার যা ধারণা ছিল তা একেবারে বদলে গেল। মনে হল আমি যেন এতদিন কার্পেটের উলটো

পিঠটাই দেখছিলাম। তাঁকে একখানা চিঠিও লিখেছি, কোনও উত্তর পাই নি। তুমি উত্তর দিতে যেন দেরি কোরো না। ভালবাসা নাও। ইতি—

অসিত

২

৮-৭-৪৯

ভাই অতুল,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিতে অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সান্ত্বনা নেই। তোমার চিঠির সুর থেকে মনে হল সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছাও যেন তোমার নেই। যদিও ভাষায় পরিষ্কার করে কোথাও তুমি লেখ নি তবু আমার মনে হল তোমার চিঠিখানা যেন ভুরু নাচিয়ে বলছে—বেশ হয়েছে। আমার স্ত্রীর স্বপক্ষে ওকালতি করে যে সব যুক্তির তুমি অবতারণা করেছ সেগুলিই হাসির যুক্তি কি না তা তুমি জান না। তুমি ধরে নিয়েছ যে হাসি আমাকে ত্যাগ করে' অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছে এবং এই পালানোটাকেই তুমি আধুনিকতার একটা মস্ত লক্ষণ বলে প্রমাণ করবার জন্য অনেকটা সময় নষ্ট করেছ। প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ থাকে। তোমার এই প্রচেষ্টারও একটা কারণ আছে, আমি জানি সে কারণটা কি, তাই তোমার উপর রাগ করতে পারছি না। তুমি অসুখী, সেই জন্যেই তোমার সকলেরই উপর রাগ। সমাজের উপর, গভর্ণমেণ্টের উপর, অতীতের উপর, বর্ত্তমানের উপর কারো উপর তুমি খুশি নও। এদের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তুমি তাই সর্ব্বান্তঃকরণে বাহবা দিয়ে ওঠ, অনেক সময় বিচার করতে ভুলে যাও যে বাহবাটা তার প্রাপ্য কি না, বাহবাটা দেওয়া

শোভন হচ্ছে কি না। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীরা আদিমকাল থেকেই পালাচ্ছে, কেবল ওই পালানোর মধ্যেই কোন আধুনিকতা বা নূতনত্ব নেই। তাকে গালাগালি দেব, না, বাহবা দেব, তা নির্ভর করছে পালানোর হেতুটার উপর। নিজের স্বার্থের জন্য যদি সে পালিয়ে থাকে তাহলে আমি অন্তত তাকে বাহবা দেবার প্রেরণ পাব না, কিন্তু পরার্থে সে যদি স্বামী-বর্জ্জন করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দিতে হবে। স্বার্থপর পশু মানব পরার্থপর হয়েই মনুষ্যত্ব লাভ করছে ক্রমশঃ। মনুষ্যত্বের দিকে তার প্রগতিও ওই একটিমাত্র মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হবে। আত্মবিনোদন বা স্বার্থবিনোদনের যত আশ্চর্য্য-জনক ব্যবস্থাই বর্ত্তমান সভ্যতা করে থাকুক না কেন আসল সভ্যতার বিচার হবে সেই সনাতন মানদণ্ডে অর্থাৎ আমরা কতটা পরার্থপর হতে পেরেছি তাই দিয়ে। তুমি হাসির অন্তর্দ্ধানের ওই একটি কারণই ঠিক করেছ কেন তাও আমার মাথায় এল না। সত্য কারণটা যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি তখন কল্পনাকে অবাধ ছেড়ে দিতে আপত্তি কি? 'হাসি কোন অচিন্তনীয় উপায়ে পাখী হয়ে উড়ে গেছে একথা মনে করতে তোমার বৈজ্ঞানিক মন যদি সঙ্কুচিত হয় হাসি কোন অচিন্তনীয় উপায়ে মারা গেছে একথাও তো ভাবতে পারতে। তার অন্তর্দ্ধানের সহস্র রকম সম্ভাবনার মধ্যে ওই একটি সম্ভাবনাই তোমার মনকে অধিকার করে রেখেছে কেন বল তো? উত্তরে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বলব? রাগ করবে না তো? যে ক্ষুধিত তার কাছে অন্নের একটিমাত্র রূপই দেদীপ্যমান যাকে চর্ব্বণ করে সে গলাধঃকরণ করতে পারে। অন্নের যে অন্য সহস্রবিধ রূপ আছে তা দেখবার বা ভাববার মতো মানসিক স্থৈর্য্য তার নেই। হতে পারে আমার এ ধারণা ভুল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে পাশবিক ক্ষুধার জন্য সভ্য মানবমাত্রেই ঈষৎ বিব্রত (অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিতও) সেই পাশবিক ক্ষুধার তাড়নায় তুমি এত

কাতর যে তাকে কেন্দ্র করেই তোমার সমস্ত দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান বিকশিত হতে চাইছে, ওই একটি শিখাকেই অনবরত প্রদক্ষিণ করছে তোমার কল্পনা-পতঙ্গ, সেই শিখায় পুড়ে মরতেও তার আপত্তি নেই।

আমি যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকতে চাই হাসির পক্ষে সে পারিপার্শ্বিক শ্বাসরোধকর এবং সেই জন্যই সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে এই সিদ্ধান্তে তুমি যে কি করে উপনীত হলে তা আমার ধারণাতীত। হাসিকে তুমি আমার চেয়ে অনেক কম দেখেছ। একবার—একদিনের বেশী দেখনি বোধ হয়—এত স্বল্পপরিচয় সত্বেও তার মনের এত খবর জানলে কি করে তুমি বল তো? ভবিষ্যতে যদি প্রমাণিত হয় যে তুমি যা ভেবেছিলে তা ঠিক তাহলে তোমার ওই তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিশ্চয়ই প্রশংসা করব। আপাতত কিন্তু পারলাম না। তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু জেনেও পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে তুমি স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, আমার এই নিদারুণ দুঃখটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছ, তোমার দার্শনিক যুক্তিগুলো আমাকে যেন 'দুয়ো' দিচ্ছে।

তুমি এখনও উপার্জ্জনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারনি জেনে দুঃখিত হলাম। বিশ্বাস কর দুঃখটা আন্তরিক! তুমি লিখেছ তোমার মেসের ম্যানেজার পাওনার জন্যে তোমাকে অস্থির করে তুলেছেন, কিছু টাকা তোমার অবিলম্বে প্রয়োজন। আমি পঁচিশটি টাকা আজ তোমাকে পাঠালাম। ঋণ-স্বরূপ নয়, এমনই পাঠাচ্ছি। টাকাটা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছি। এক মাসিকপত্রের সহৃদয় সম্পাদক আমার একটা লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন।

তোমাকে আরও অনেক কথা লেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল নয়, সময়ও হাতে নেই। রাত জেগে চিঠি লিখছি।

এখন রাত প্রায় একটা! তাছাড়া আর একটা কারণেও থামছি। মনে হচ্ছে সমস্ত রাত্রি ধরেও যদি লিখে যাই আমার দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না। যে দুঃখ অবর্ণনীয় তাকে বর্ণনা করবার চেষ্টা না করাই ভাল। অবর্ণনীয় দুঃখ যে মন এমনিতেই বুঝতে পারে সে মনও তোমার নেই, সুতরাং থামলাম। ভালবাসা নাও। ইতি

তোমারই
অসিত

৩

কলিকাতা
১৫-৭-৪৯

ভাই অসিতবরণ,

ইচ্ছা করিয়াই একটু বিলম্ব করিয়া উত্তর দিতেছি। অশুভস্য কাল হরণং—রাবণ রাজার এই উপদেশটি মানিতে ইচ্ছা হইল। মনে হইল অশুভ সংবাদটা তাড়াতাড়ি দিয়া লাভ কি। কিন্তু খুব বেশী দেরি করিতেও পারিলাম না। ভাবিলাম খবরটা পাইলে তুমি হয়তো কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অফিসে যাইবার মুখে তোমার পত্রটি পাইয়াছিলাম। চিত্রা থাকিলে তখনই তাহাকে বিজয়বাবুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগাইয়া দিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু চিত্রা বাপের বাড়ি গিয়াছে। আমিই একটা ছুতা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। বেচারী কাঁহাতক আর একনাগাড়ে দাসীবৃত্তি করে বল। প্রত্যহ বাসন মাজিয়া, ঘর মুছিয়া (এত কাজের মধ্যেও রোজ ঘর মোছা চাই, মানা করিলেও শোনে না) রান্না করিয়া,

জামা কাপড়ে সাবান দিয়া বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে তো, এত হাড়ভাঙা খাটুনিতে অভ্যস্ত নয়। তাই যখন শুনিলাম যে তাহার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হইতেছে, তাহার বৌদিদি তাহাকে যাইতেও লিখিয়াছে তখন আমি আর আপত্তি করিলাম না, পাঠাইয়া দিলাম। আমার একটু কষ্ট হইবে, তা হোক। খরচও মন্দ হইল না, কিন্তু সে কথা ভাবিলে কি চলে? আমি নিজেই স্বপাকে কোনরূপে চালাইতেছি। এইসব কারণে তোমার পত্র পাইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুর খোঁজ লইতে পারি নাই। আপিস হইতে ফিরিয়াই তাহাদের বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তাহারা সকলে সিনেমায় গিয়াছে, রাত্রি বারোটার আগে ফিরিবে না। পরদিন সকালে উঠিয়াই তাহাদের বাসায় গেলাম, বিজয়বাবুর দেখা পাইলাম না। শুনিলাম ভদ্রলোক দ্বিপ্রহরে বাড়িতে থাকিবেন। তাহাদের বাড়িতে যে ছেলেটির সহিত দেখা হইয়াছিল কথায় কথায় সে বলিল যে বিজয়বাবু না কি কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। কবে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন প্রশ্ন করাতে ছেলেটি হিসাব করিয়া যে তারিখটি বলিল তাহাতে আমি মনে মনে চমকাইয়া উঠিলাম। ঠিক ওই তারিখেই শ্রীমতী হাসিও হস্টেল ছাড়িয়া গিয়াছে। স্থির করিয়াছিলাম যে দ্বিপ্রহরে আপিস হইতে ছুটি লইয়া আসিয়া বিজয়বাবুর সহিত দেখা করিব। কিন্তু বড়বাবু ছুটি দিলেন না। সন্ধ্যার সময় আসিয়াই বিজয়-বাবুর বাড়িতে গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বিজয় বাবুর ভগ্নী লতিকা বলিলেন—বিজয়বাবু বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ট্যাক্সি করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে গেলে হয়তো তাঁহার সহিত দেখা হইতে পারে। মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিল বলিয়া আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। আমি একটা ট্যাক্সি করিয়াই হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। বিজয়-বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল, কিন্তু বেশী কথা বলিবার অবকাশ ছিল

না। অবকাশ থাকিলেও বিজয়বাবু যাহা বলিলেন তাহার বেশী কিছু বলিতেন না। তিনি বলিলেন, হাসির সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাহা আপনাকে বলিব না, যদি প্রয়োজন বোধ করি অসিতবাবুকে জানাইতে পারি। তাঁহার ঠিকানাটা আমাকে দিয়া যান। ট্রেণ ছাড়িতেছিল সুতরাং তাঁহার সহিত বেশী কথাও কহিতে পারিলাম না। বিজয়বাবু বলিলেন যে তিনি বিলাত যাইতেছেন পড়াশোনা করিবার জন্য। ভাই, সত্যকথা বলিতে কি বিজয়বাবুর হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে নাই। আমি যতটুকু জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহা অকপটে তোমাকে জানাইলাম। তোমার ঠিকানা বিজয়বাবুকে দিয়া আসিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রানর্থা করি তিনি যেন তোমাকে সুসংবাদই দেন। আমি বিজয়বাবুর ঠিকানাও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে তাহার ঠিকানা এখনও অনিশ্চিত। কিছুদিন পরে তাঁহার বাড়ী হইতে তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে। আমি খোঁজ রাখিব এবং ঠিকানা পাইলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আশা করি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

তোমারই মহেন্দ্র

৪

লক্ষ্ণৌ

২৫-৭-৪৯

ভাই মহেন্দ্র,

হাসির খবর পাইয়াছি। বাড়ী হইতে আজ মায়ের চিঠি পাইলাম। মা লিখিয়াছেন, "তুমি বোধ হয় জান যে বেয়াই মশাই বৌমাকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। লিখিয়াছেন হঠাৎ ঠিক হইয়া গেল,

পত্র লিখিয়া আমাদের অনুমতি লওয়ার সময় ছিল না। আশা করি আমরা ইহাতে কিছু মনে করিব না। ইহাতে মনে করাকরির কিছু নাই, কিন্তু এটা বৌমার পরীক্ষার বছর, এ সময় কামাই করা কি ঠিক হইল? যাক যাহা হইবার তাহাতো হইয়াই গিয়াছে এখন ভালয় ভালয় ফিরিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বেয়াই মশাই, তোমাকেও আশা করি জানাইয়াছেন"—ইত্যাদি।

শ্বশুর মশাই আমাকে কিন্তু কিছুই জানান নাই। হইতে পারে জানাইয়াছিলেন চিঠিটা মারা গিয়াছে। মারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক হাসির একটা খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হইলেও চিন্তাধারা একটা বিশেষ পথ পাইয়াছে। এতদিন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছি না—হাসি আমাকে কোনও পত্র লিখিল না কেন। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হইতেছে। বিজয়-বাবুর আচরণও বেশ রহস্যময়। তিনিও এখনও পর্য্যন্ত কোন চিঠি দেন নাই। আমার মনে হইতেছে তিনি তোমার সহিত একটু রসিকতা করিয়া গিয়াছেন। আসলে তিনি হাসির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, হাসি তাহার বাবার সহিত বেড়াইতেই গিয়াছে। পরীক্ষার সময় বেড়াইতে গেলে আমি পাছে রাগ করি সেইজন্য হয়তো আমাকে কিছুই জানায় নাই। যাই হোক, এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি আছে? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। একটা মজার কথা শুনিবে? বিপদে পড়িয়া আজকাল ভগবানের কথা মাঝে মাঝে মনে হইতেছে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই অসিত

ভাই অসিত,

তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম আজ। মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর দি হেল্প। টাকাটা এসে পড়াতে সত্যিই খুব উপকৃত হয়েছিলাম। সকলের পাওনা আজ শোধ করেছি, তোমরটাও করলাম। এখন আমি অঋণী। আমার যা কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল সমস্ত বিক্রি করে' দিয়েছি। একটি ছেঁড়া গেঞ্জি এবং ছেঁড়া লুংগি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। দুনিয়ার দিকে চেয়ে এবার বলতে পারি—নাউ, উই আর কুইটস্। এবার সরে পড়তে চাই। এখানে কারও সঙ্গে খাপ খেল না আমার! এত তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখছি আমার মতো লোকের বাঁচবার স্কোপ নেই এখানে। গলায় দড়িটা লাগিয়ে ঝুলে পড়তে ভয় করছে কিন্তু। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছে যে, শীতকালে ঠাণ্ডা জলের বালতিটা গায়ে ঢালবার আগেও ঠিক এইরকম ভয় করে, কিন্তু সাহস করে' ঢেলে ফেলতে পারলেই পরম আরাম। মৃত্যুর পরও হয়তো তাই। মনে পড়ছে হ্যামলেটের কথা—টু ডাই, টু শ্লীপ, পারচান্স টু ড্রীম — .

সেই স্বপ্নলোকের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করছি। তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি আর থাকব না। তোমরা তোমাদের সনাতন মানদণ্ড দিয়ে নিজেদের জমিদারি জরিপ করতে থাক আমি চললুম। যাবার আগে তোমার স্ত্রীর সঠিক খবরটা জেনে যাবার কৌতূহল ছিল। কিন্তু জীবনে অনেক কৌতূহলই মেটেনি, এটাও মিটল না। তবে মরবার আগে আশা ক'রে যাচ্ছি শি উইল প্রুভ হার মেট্ল্। আই নো শি উইল। তোমার সনাতন মানদণ্ডকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সে একদিন তোমাকে বলবে—আমি মানুষ, আমিই আমার মানদণ্ড। তোমাদের সমাজে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই, হাসির প্রকৃত মুল্য নেই, হাসির প্রকৃত মূল্য তোমরা দেবে না, সনাতন মানদণ্ড নিয়েই মাথা ঘামিয়ে মরবে তোমরা, কিন্তু হাট ডাজ নট্ অলটার দি ফ্যাক্ট হাট শি ওয়াজ এ জেনুইন জেম্। যাক্ চললুম। গুড বাই। ইতি— তোমারই অতুল

হাসির চিঠি

শ্রীচরণেষু,

তুমি নিশ্চয় আমার আশা এতদিনে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছ। আমাকে ভুলে গেছ এ কথা লিখে তোমার স্মৃতিশক্তির অপমান করতে চাই না। আমি যদিও এতদিন আত্মগোপন করে' ছিলাম কিন্তু তোমার সমস্ত খবর আমি রেখেছি। তুমি যে পাশ করে' চাকরি নিয়েছ, সে খবরও আমি জানি, তুমি যে বিয়ে করনি তা-ও আমার অজানা নয়। তবে একটা কথা বিশ্বাস কর, তুমি যদি আবার বিয়েও করতে তা হলেও আমি তোমাকে এ চিঠি ঠিক এমনি ভাবেই লিখতাম। আর একটা অনুরোধও তোমাকে করছি, আমার এ চিঠি পড়ে আমার সম্বন্ধে আর যে ধারণাই তুমি কর, আমাকে উপযাচিকার পর্য্যায়ে ফেলো না।

নিজের স্বপক্ষে আমার বলবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের যে সব সুবিধা ছিল আমার সে সব কিছুই নেই। তোমাদের তরফের কোনও নির্য্যাতন আমাকে ঘর-ছাড়া করে নি। আমি পালিয়েছিলাম লজ্জায়!

যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই আমি অনুভব করছি যেন আমার চারিদিকে অদৃশ্য একটা প্রাচীর রয়েছে। মনে হত, প্রাচীরের ওপারে যে জীবনযাত্রা চলছে তার সঙ্গে আমার যেন যোগ নেই। আমার বাবা, মা, দাদামশাইকে ঘিরে যেন একটা রহস্যকুহেলী আছে, তা যে কি আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হ'ত সবাই যেন আমার সঙ্গে পোশাকী ভদ্র ব্যবহার করছে। তোমার সুন্দর চিঠিগুলি যখন পেতাম তখনও ঠিক ওই কথাই মনে হত। ভাবতাম, কেউ আমাকে কখনও একটাও কড়া কথা বলে না কেন? কখনও কারো কাছে একটাও বকুনি খেলাম না, আমি সত্যই কি এতটা ভাল? মনে হত সমস্ত মেকি এবং মনে হওয়া মাত্র ভয় হত কেমন একটা। একটা কাঁচের ঘরে বাস করছি মনে হত! বাইরের সবই

দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাইরের সঙ্গে যেন যোগ নেই। যে অপরাধ করে আমার ভাই-বোনেরা মায়ের কাছে মার খেয়েছে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে, ঠিক সেই অপরাধ করে' আমি বরাবর রেহাই পেয়েছি। মা হেসেছেন, বাবা বড় জোর বলেছেন—ছি, ওরকম করতে নেই। দাদামশাই তো আমার সব কিছুই ভালো দেখতেন। আমি যেন কোনও ধনী জমিদার এবং তিনি যেন আমার বেতনভোগী মোসায়েব।

একদিন কিন্তু কাঁচের ঘরটা ভেঙে পড়ল এক অভাবিত উপায়ে। আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে দাদামশায়ের শ্বশুরকুলের কি রকম যেন সম্পর্ক আছে একটা। দাদামশায়ের কাছ থেকে তিনি আমার জন্ম-রহস্যটা শুনেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমিও শুনলাম একদিন। অধ্যাপিকাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর ছিল না। কেন জানি না, তিনি আমাকে সু-নজরে দেখেন নি কোনও দিন। মেয়েরা বলত ওঁর স্বভাবই নাকি ওই রকম, রূপসী মেয়ে দেখলেই উনি তার উপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেন, কেউ ভাল শাড়ি পরলে সঙ্গে সঙ্গে চটে যান তার উপর। আমি রূপসী কি না জানি না, কিন্তু তোমাদের দৌলতে ভালো ভালো শাড়ির অভাব তো আমার ছিল না, সে সব পরতে কার্পণ্যও আমি করি নি কোনও দিন। মিস ঘোষ একদিন আমায় বললেন, "এমনভাবে সেজে আসতে লজ্জা করে না?" আমি বললাম, "লজ্জা পাওয়ার মতো সাজ করি নি তো। শাড়ি তো আমার মা আমাকে দিয়েছেন।" "তোমার মা?"—একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। তারপর বললেন, "এসো, আমার সঙ্গে।" আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার মাকে মনে পড়ে তোমার?" আমি তো অবাক। তারপর তিনি যা বললেন ....

ঠিক তার পরদিনই বাবা এলেন কোলকাতায়। বাবাকে গিয়ে অদ্ভুত গল্পটা বললাম। শুনে তাঁর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "যা শুনেছ তা সত্যি। কিন্তু

ও নিয়ে এখন আর বেশি মাতামাতি করে লাভ নেই।" আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন। ঠিক সেই সময় তোমার বন্ধু অতুল-বাবু এলেন আমাকে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার বোস আমার গলা দেখে সন্দেহ করলেন যে সিফিলিসের বিষ হয়তো আমার রক্তে আছে। পরীক্ষা করবার জন্য রক্ত নিয়ে নিলেন তিনি এবং পরীক্ষা করে' জানালেন যে বিষ আছে। আমাকে ইনজেকশন নিতে হবে।

প্রথমেই তোমার কথা মনে হল আমার। মনে হল, তোমাকে আমরা ঠকিয়েছি। তুমি আমাদের কথায় বিশ্বাস করে খাঁটি সোনা বলে যা নিয়েছ আসলে তা গিল্টি করা পিতল। আমার সমস্ত আত্মসম্মান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ল যেন। সব চেয়ে রাগ হল বাবার উপর। মনে হল তিনিই প্রতারণা করে' আমার ও তোমার জীবনের মধ্যে যে প্রাচীর তোলবার আয়োজন করেছিলেন সে-ই প্রাচীরই এবার দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। ঠিক করলাম, বাবার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব না। সমস্ত কথা অকপটে তোমাকে জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবার কথা আমার মনে জেগেছিল একবার, কিন্তু তাতেও বাধল। মনে হল এ কথা শুনে হয়তো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি ছুটে আসবে কেবল ভদ্রতার খাতিরে। সমস্ত ব্যাপার-টাকে চাপা দেবার জন্য নানা রকম মিথ্যারও আশ্রয় নিতে হবে হয়তো তোমাকে বাধ্য হয়ে। তাই ঠিক করলাম তোমাকেও কিছু জানাব না। মানে মানে চুপি চুপি সরে পড়াই ভাল। তোমার আমার মধ্যে যে বাধা দুস্তর হয়ে উঠেছে তা' সরিয়ে দেবার শক্তি যদি নিজে কোনদিন সংগ্রহ করতে পারি তবেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে শুধু যে নিজেরই অপমান তা নয়, তোমারও অপমান। মনে হল তার চেয়ে মরণ ভাল।

তোমার 'আধুনিকা' কবিতার সেই মেয়েটিকে আমার খুব ভাল

লাগে নি। সে দুর্জ্জয়কে জয় করেছিল নিজের সুখের জন্য, নিজের একটা বিশেষ খেয়ালকে চরিতার্থ করবার জন্য। তবু কিন্তু সেই মেয়েটিই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে। রাত্রে ডাক্তার বন্ধুর চিঠি এবং রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টখানার দিকে চেপে চুপ করে' বসেছিলাম। গলাটা ব্যথা করছিল, মাথার ভিতর আগুন জ্বলছিল, দপ দপ করছিল রগের শিরগুলো। হঠাৎ একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল মানসপটে। চুলগুলি বব-করা, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি জ্বলছে, ময়লা ময়লা রং, ঘন-নিবদ্ধ যুগ্মভ্রূ, চোয়াল, চিবুক, অধর সবই সুপুষ্ট। আমার দিকে চেয়ে সে যেন বলল—"ভাবছ কি, বেরিয়ে পড়। প্রমাণ করে' দাও যে তোমারও শক্তি আছে। অসুখের বিষ যদি শরীরে কোনরকমে ঢুকেই থাকে, তার প্রতিকার কর। এটা বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিকার মিলবেই। ভেঙে পড়ছ কেন?" তোমার 'আধুনিকা' কবিতার সেই মেয়েটি আমার মনে মধ্যে যে এমন জীবন্ত হয়ে আবির্ভূত হবে তা ভাবতে পারি নি। তার কথাগুলো আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

....ঠিক করলাম অবিলম্বে কোলকাতা ছাড়তে হবে। আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিল সম্বলপুরে। সে অনেকদিন থেকে প্রায় প্রতি চিঠিতেই আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল যে আমি যদি তাদের নূতন সংসারে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি তাহলে তারা খুশি হবে খুব। সম্বলপুবেব উদ্দেশ্যেই যাত্রা করলাম অবশেষে। আমার তোরঙ্গ বিছানা পড়ে রইল। আমি আমার ছোট ব্যাগে সামান্য দুই একখানি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সম্বলপুরে আমি দিন চারেক মাত্র ছিলাম। সেখান থেকেই একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে আমি দিল্লীতে চলে আসি। ....আমার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির সুদীর্ঘ বর্ণনা করে' তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার মানসিক অবস্থার কথা বলেও কোন লাভ নেই। শুধু যে তা নিষ্প্রয়োজন তা নয়, তা বলার বিপদও আছে। মনে যা যা হয়েছে তার অকপট বর্ণনা শুনে

তার সত্য মর্য্যাদা দিতে যদি তোমার দ্বিধা জন্মে তাহলে আমার নিজের কাছেই নিজের মুখ দেখাতে লজ্জা করবে। সুতরাং ওসব কথা থাক। কেবল যে কথাগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তাই তোমায় জানাচ্ছি।

আমি এতদিন ধরে' সুযোগ্য ডাক্তার দিয়ে নিজের চিকিৎসা করিয়েছি, গলার ঘা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তিনবার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি তিন জায়গায়। রক্তে আর কোনও দোষ নেই। রিপোর্ট তিনটি পাঠালাম এই সঙ্গে। এখন আমার মনে হচ্ছে সেই বব-করা আধুনিকাটি আমাকে যে প্রতিকারের সন্ধানে উৎসাহিত করেছিল সে বৈজ্ঞানিক প্রতিকার হয়তো মিলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে এ প্রতিকারের শেষ মুল্য যে সামাজিক সিন্দুকে বন্ধ আছে তার চাবি কোথায় সংগ্রহ করতে পারব?

তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেয়েছি আজ বাবার লেখা সেই চিঠিগুলো পড়ে। চিঠিগুলো সদানন্দ বাবু তোমাকে দিয়েছিলেন এবং সেগুলো তুমি বাবার নামে ফেরত পাঠিয়েছিলে এ খবর পেলাম বাবাকে তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে সেইটেই পড়ে। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলোর সঙ্গেই তোমার চিঠিটাও ছিল। বাবা বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নানা শহরে। আমার বাক্সতে আমার বান্ধবীদের যত ঠিকানা ছিল প্রত্যেক জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। শেষে সম্বলপুরে এসে আমার সন্ধান পান। মাস দুই আগে আমি অফিস থেকে ফিরছি হঠাৎ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললেন—'ফিরে চল।' কিন্তু অত সহজে ফিরে যাওয়ার পাত্রী আমি নই। বললাম তাঁকে সে কথা। আমার পিছু পিছু তবু আসতে লাগলেন তিনি। আমি ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি, ইক্‌মিক্ কুকারে নিজেই রেঁধে খাই। বাবা আমার বাসায় এসে অনেক সাধ্যসাধনা করলেন আমাকে। কিন্তু ফল

হল না কিছু। উঠে চলে গেলেন শেষে। তার পরদিন সকালে দেখি আমার বাসার সামনে যে নোংরা হোটেলটা আছে তাতেই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত আমার, রোজই তিনি আমাকে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করতেন। একদিনও কিন্তু তিনি নিজের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করেন নি, আমার প্রকৃত জন্ম-রহস্য যে কি তা-ও বলেন নি। মিস্ ঘোষ আমাকে আড়ালে ডেকে এনে যা বলেছিলেন তার সার মর্ম এই যে আমার বাবা যৌবনকালে একজন মুসলমানীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার গর্ভেই আমার জন্ম হয়েছে। এর বেশী তিনিও বোধ হয় আর কিছু জানতেন না। বাবাও আমাকে এর বেশী কিছু জানতে দেননি। তিনি বারম্বার একটি কথাই শুধু আমাকে বলেছেন—আমি দোষ করেছি, কিন্তু সে দোষের কি ক্ষমা নেই? বহুকাল পূর্বে সদানন্দবাবুকে তিনি যে সব কথা লিখেছিলেন তা যদি আমাকে বলতেন তাহলে আমি হয়তো অত নিষ্ঠুর হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম না। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি। ঐ নোংরা হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন কেবল প্রত্যাশা করেছেন যে আমি তাঁকে ক্ষমা করে' আবার ফিরে যাব। ফিরে গেলে আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা আমাকে যাতে কিছু বলতে না পারেন সেজন্য তাঁদেরও তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন যে আমাকে নিয়ে তিনি দক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন। তোমাকে তিনি কোনও চিঠি লিখেছিলেন কি না জানি না, খুব সম্ভব লেখেন নি, কারণ তিনি বলতেন, যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব। রোজই সকালে উঠে দেখতাম তিনি সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বাসার দিকে চেয়ে। আমি যখন আপিস যেতাম আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। বিকেলে আপিস থেকে বেরিয়েই দেখতাম দাঁড়িয়ে আছেন। আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। আপিসের দারোয়ানটার মুখে একদিন

শুনেছিলাম সারা দুপুরটা তিনি আপিসের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান রোদে রোদে। এমনিভাবেই চলছিল। পরশুদিন সকালে উঠে আমার বাসার জানলা খুলে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বাবা যেখানে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখানে নেই। একটু ঝুঁকে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। আপিস থেকে ফিরবার সময় দেখলাম তিনি নেই। মনে হল আমার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি বোধ হয় চ'লে গেলেন। তবু বাসার কাছাকাছি এসে ইচ্ছে হল হোটেলে খোঁজ করি একটু। চাকরটা বললে কাল রাত থেকে তিনি অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। আমি যখন গেলাম তখন তাঁর শেষ অবস্থা। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকালাম একজন। তিনি এসে বললেন ষ্ট্রোক হয়েছে বাঁচবার আশা নেই। একটু পরেই মারা গেলেন। তাঁর ওই ঘরেই সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো আমি পাই, তুমি যে চিঠিটা তাঁকে লিখেছিলে সেটাও সেই সঙ্গে ছিল। চিঠিগুলো পড়ে' আমার আশা হ'ল। মনে হল চিঠিগুলো তুমি যদি মন দিয়ে পড়ে' থাক তাহলে আমাদের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা হয়তো তুমি করনি। তুমি এ যুগের শিক্ষিত ছেলে, প্রচলিত কুসংস্কারের কলুষে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিম্বা ঠিক জানি না, হয়তো যেগুলোকে আমি কুসংস্কার মনে করছি সেগুলো তোমার চক্ষে কুসংস্কার নয়। সে যাই হোক, তুমি সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো পড়েছ এইতেই আমি কেন জানি না সাহস পেয়েছি এবং তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বাবার হয়ে প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যদিও নিজের যুক্তি অনুসারেই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন কিন্তু সে যুক্তি আমার কাছে খুব জোরালো মনে হল না, তোমার কাছেও হয়নি হয়তো। তাই ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস কর তোমার এ ক্ষতি পূরণ করবার যদি কোনও উপায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তা করতাম। কিন্তু যে ঘটনা একবার ঘটে গেছে তার

ঘটনাত্ব লোপ করবার উপায় আর নেই। ইচ্ছে করলে আমাকে এখন তোমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করতে পার। যদি কর আমি আমি নালিশ করব না। এটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলে' মেনে নেব। ভাবব দুর্জ্জয়কে জয় করার যে মন্ত্র সেই আধুনিকা মেয়েটি আমাকে শিখিয়েছিল সে মন্ত্র আমার ক্ষেত্রে সফল হল না কারণ আমি যা চাইছি তা টেস্টটিউবের ভিতর বা সার্জ্জিকাল টেবিলের উপর পাওয়া যাবে না কখনও। আমি কি চাইছি তা মুখ ফুটে বলবও না কোনদিন। তবে একটি কথা আমাকে বলতেই হবে, তুমি যদি আবার আমাকে ফিরে যেতে বল আমি ফিরে যাব। আমাদের সমাজে যে আর্থিক কারণের জন্য বাধ্য হয়ে স্ত্রীদের অনিচ্ছাসত্বেও স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হয় সে কারণ যদিও আমার ক্ষেত্রে নেই, তবু যাব, কারণ তোমার মতো লোকের সহধর্ম্মিণী হওয়া সৌভাগ্য বলে' মনে করি আমি। আমার স্পর্শে পাছে তুমি কলঙ্কিত হও তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নিজেকে বিশুদ্ধও করেছি এতদিন ধরে'। ডাক্তাররাই আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন এবার তুমি নির্দোষ নীরোগ, এবার তুমি সমাজে ফিরে যেতে পার। তুমি আমাকে ফিরে নেবে কি? তোমার দিক থেকে যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তাহলে আমি ফিরতে চাইনা। দোহাই তোমার, অনুকম্পা-ভরে আমাকে ফিরে যেতে বোলো না। কারণ ঠিক যেখানটিতে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই সেখানটি তোমার চক্ষে গ্লানিহীন না হলে আমি দাঁড়াতে পারব না। বাইরের বহুলোক কুৎসার কর্দ্দমে আমাকে নাইয়ে দেবে জানি কিন্তু সব আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারব তুমি যদি আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত হও। আর একটা কথা। গোড়াতেই সে কথা তোমাকে বলেওছি একবার। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই বটে কিন্তু জোর করে' তোমার ঘাড়ে চাপতে চাই না, ছলা কলা করে' বা কান্নাকাটি করে' তোমার মন ভোলাবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

—আমার সম্বন্ধে তুমি কি কি শুনেছ তা জানতে কৌতূক হয়। বিজয়বাবু তোমাকে কোনও খবর দিয়েছিলেন কি? আমি যে ট্রেণে সম্বলপুর রওনা হই বিজয়বাবুও সেই ট্রেণে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। বললেন একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে' বিলেত যাওয়া তাঁর ইচ্ছে, সেই চেষ্টায় দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কোন কারণে কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের লুকিয়ে। তিনি যেন কথাটা কারও কাছে ফাঁস না করে' দেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেবেন না। প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন কি না কে জানে। আমার এই দীর্ঘ বিদেশ বাসের সময় আর কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে সত্য খবর তোমাদের জানাবার সুযোগ কারো হওয়ার কথা নয়। তবে মিথ্যে খবর তৈরী করতে পারেন এরকম মাথা-ওলা লোক আমাদের দেশে অনেক আছেন। না জানি আমার সম্বন্ধে কি কি শুনেছ তুমি।

—তোমার চিঠিগুলি এখনও আছে আমার কাছে। অনেকবার পড়েছি সেগুলো। প্রায়ই পড়ি। মনে হয় তোমার চিঠিগুলির ভিতর তোমার যে সত্তা প্রকাশিত তাই যদি তোমার স্বরূপ হয় তাহলে আমার ভয় নেই। তোমার বিচারে যদি আমি বর্জ্জনীয়ও হই তাহলেও আমার বলবার কিছু থাকবে না। মনে হবে তুমি কবি, তুমি ঠিক বিচারই করেছ, ভুল হয়নি তোমার। এতবড় চিঠি তোমার কাছে আর কখনও লিখিনি। কে জানে এই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। আমার প্রণাম নাও। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। ইতি—

হাসি।

অসিতের উত্তর

বোম্বে

১০-৬-৫০

কল্যাণীয়াসু,

হাসি, আমার টেলিগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। আমি দুদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম হঠাৎ। সুতরাং নিজেই যাচ্ছি তোমাকে আনতে।' প্লেনে যাব। তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখ। এ চিঠি পৌঁছবার আগেই আমি গিয়ে হয়তো পৌঁছব, তবু দু' কলম না লিখে পারলাম না। ইতি—

তোমারই অসিত।

সমাপ্ত